কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে সিঁদূরের ফোঁটা পরা মারাঠিমেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারিদিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড় একটা সঙ্কোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে ষ্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোলদিঘীকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা!

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্ম্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার ত তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে পাড়ে মেয়েদের সাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের ত কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য। এইটুকু আবরণ এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড় একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একটা জিনিষ বোম্বাই সহরে অত্যন্ত বড় করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশীলোকের ধনশালিতা। কত পার্সি, মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড় বড় বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারীতে এইজন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারীর সম্পদ বদ্ধ জলের মত—তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখিনা, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধন সঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি, পার্সি, গুজরাটি, পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মত—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিষটাকে আমাদের দেশ সচেতন ভাবে অনুভব করিতেই পারিল না এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্ত্তি উদার ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত।

(ডেনমার্ক)

য়ুরোপের মানচিত্রে যে দেশটী অন্যান্য দেশের তুলনায় আয়তনে ছোট এবং যাহার জনসংখ্যা লণ্ডন সহরের অর্দ্ধেক, সেই দেশটী কৃষিকর্ম্মে ও সমবায়-সমিতি গঠনের প্রণালীতে সমস্ত য়ুরোপকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, বহু প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কৃষি-উদ্যোগকে দেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ডেনমার্ক সামান্য সম্বল লইয়া বহুকাল যেমন করিয়া আপনার পথটি কাটিয়া লইয়াছিল তাহার ইতিহাস পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমেরিকায় অবস্থান-কালে আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে কোপেনহেগেন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক প্রফেসার বোগ্গিল্ড (Professor Boggild) আমেরিকার দুগ্ধ-বাণিজ্য সম্বন্ধে

অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন; তাঁহার বয়স অনুমান ৬০ হইবে। অনভ্যস্ত ইংরেজি ভাষায় ডেনমার্কের কঠোর সাধনার ইতিহাস আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম

নেপোলিয়ানের সমরোৎসাহ যখন উন্মত্ত দৈত্যের মতন সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে চলিয়া গেল, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া ডেনমার্ক তাহার আক্রমণ সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। ইহার আঘাত ডেনমার্কের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল করিয়া তুলিল, ডেনমার্কের সর্বাপেক্ষা উর্ব্বর দুইটি প্রদেশ যুদ্ধদেবতা কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু ডেনমার্কের অন্তরে যে শক্তি আচ্ছন্ন ছিল, কঠোর দুঃখের আঘাতে তাহা সবেগে ফুটিয়া উঠিতে পারিল—এবং ডেনমার্কের কর্ম্মবীরগণ স্বদেশের মুক্তির জন্য সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন কর্ণেল ডাল্‌গাস্ একটি সমিতি স্থাপন করিয়া অনুর্ব্বর জলাভূমি ও পরিত্যক্ত জমিগুলির আবাদের প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হইতেই ডেনমার্কে কৃষিউদ্যোগ পুনর্জন্ম লাভ করিল। এই সমিতির চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে রাস্তা প্রস্তত, কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইল; যাহাতে কৃষিবিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নানা স্থানে প্রমাণ ক্ষেত্র, ও পরীক্ষাগার স্থাপন করা হইল। আজও ডেনমার্কে যত কিছু বৃহৎ কৃষিঅনুষ্ঠান কিংবা পল্লীর উন্নতি চেষ্টা সম্ভব হইতেছে, এই Danish Heath Society-ই ইহার উদ্যোগী; সমিতি ৭৫ হাজার বিঘা বালুজমিকে উর্ব্বর করিয়াছে, প্রায় তিনলক্ষ বিঘা জমিতে গাছ রোপন করিয়াছে, কৃষিবিদ্যা-বিস্তারের জন্য নানাস্থানে পাঁচশত কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত করিয়াছে, পরীক্ষাগারে শস্য, সার ও মাটি বিশ্লেষণ করিয়া কৃষিকর্ম্মে সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। প্রত্যেক সভ্যকে বাৎসরিক চার ক্রোণার অর্থাৎ তিন টাকা ছয় আনা চাঁদা দিতে হয়। সমিতি হইতে পঞ্চাশ জন কৃষিতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মীকে বেতন দিয়া রাখা হইয়াছে—কৃষিবিষয়ক সমস্ত ব্যাপারে কৃষকগণ ইঁহাদের সহায়তা লাভ করিতে পারে। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া কৃষি-বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন।

ডেনমার্কে যে অল্পকালের মধ্যে কৃষি-উন্নতি সম্ভব হইয়াছে এবং সমবায় চেষ্টা দ্বারা দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম এত বিস্তৃত, ও বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছে, তাহার দুইটি প্রধান কারণ আছে—একটি ভূমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত, দ্বিতীয়টি—কৃষি-শিক্ষা-বিস্তার। জমির ভোগদখল প্রণালীটি কি এবং উহা দ্বারা ডেনমার্কের কৃষকগণ কি ভাবে উপকৃত হইয়াছে, বারান্তরে বিস্তৃত করিয়া তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। কৃষক সমস্তদিন ধরিয়া যে জমিটুকুতে তার সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষে দান করে, সেই ভূমিখণ্ড যে তার নিজস্ব এই বোধ কৃষি-উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। যে দেশেই প্রজাস্বত্ব স্থায়ী, কৃষি সেখানেই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি যখন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লইয়া মাননীয় মিঃ গোখেল আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন আশা করিয়াছিলাম কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের পথ এইবার বোধহয় মুক্ত হইতে পারিবে—কেননা প্রাথমিক শিক্ষা না হইলে কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধীয় আধুনিক তথ্য সকল জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে। সকলেই জানেন প্রস্তাবটী সরকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন; গভর্ণমেণ্টের এই উপেক্ষা আমাদিগকে তত আঘাত করে নাই—কিন্তু দেশের একদল ধনী মহারাজা, জমিদার ও কোনো কোনো শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কূটতর্ক উত্থাপন করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তখন লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় সমস্ত অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যতই যুক্তি তর্ক বিস্তার কর না কেন, ভারতবর্ষের নিরক্ষর বিপুল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত না বিস্তৃত হইবে, ততদিন আমাদের দেশের দুর্গতির অবসান হইবে না। যে প্রণালী ধরিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কৃষি উন্নতি সম্ভব হইয়াছে আমাদের দেশে সেই সকল পথ যে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহার প্রধান একটি কারণ—জনসাধারণের শিক্ষার অভাব, একথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

ডেনমার্ক যে বিশেষ কারণে সুপ্রসিদ্ধ তাহা—ইহার Co-operative movement; যত প্রকার কৃষিকর্ম্মে ডেনমার্ক দেশীয়েরা প্রাধান্য ও প্রচুর সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, সমবায় চেষ্টাই তাহার মূল। অল্পকালের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার নিমিত্ত ইঁহারা দুগ্ধ ব্যবসায় দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে লাগিলেন—কেননা শস্যাদি উৎপন্ন করা লাভজনক হইলেও গো-পালন, দুধ বিক্রয় ও মাখম, পনির ইত্যাদি প্রস্তত দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যে অধিক উপার্জ্জন সম্ভব। সম্মিলিত দুগ্ধব্যবসা দ্বারা ডেনমার্কে যথার্থই বহুকল্যাণ সাধিত হইয়াছে; ১৮৮২ সালে প্রথম সম্মিলিত কারবার স্থাপিত হইয়া আজ ডেনমার্কের মতন ক্ষুদ্রাকৃতি দেশটীতে প্রায় ১১২৫টী সম্মিলিত দুগ্ধকারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহার মোট সভ্য সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ; সমস্ত ডেনমার্কে অনূন দেড়লক্ষ গাভী আছে, তন্মধ্যে একলক্ষের অধিক বিভিন্ন

সমবায় সমিতির সম্পত্তি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এইরূপ এক একটী কারবারে প্রায় ১৮০০০৲ টাকা আবশ্যক হয়—দেড়শত কৃষকের মধ্যে ঐ টাকা সমান ভাগ করিলে গড়ে ১২০৲ টাকা করিয়া পড়ে। এই প্রণালীতে ডেনমার্কে বহু সংখ্যক মিলিত দুগ্ধব্যবসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টা যে সার্থক হইয়াছে তাহা ১৯০৮ সালে রপ্তানির তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়; ঐ সালে ডেনমার্ক ইংলণ্ডে স্কট্ল্যাণ্ডে ও আয়র্ল্যাণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৫০০,০০০ পাউণ্ড মুল্যের মাখম, ডিম ও বেকন্ (মাংস) পাঠাইয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, কি করিয়া ডেনমার্ক দেশীয়েরা নিজেদের প্রয়োজন সঙ্কুলান করিয়া এত টাকার জিনিষ রপ্তানি করিতে পারিল! সমবায় কারবার ও ইহার প্রণালী সম্বন্ধে ডেনমার্কের নিকট যথেষ্ট শিক্ষা করিবার আছে। য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান ও সুদূর আমেরিকা হইতে কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ ডেনমার্কে আসিয়া ইহাদের নিকট হইতে সমবায় কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিয়া যান। আগামী বারে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আকাশের রং নীল কেন?

আকাশের রং নীল কেন, অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড রেলি ইহার একটি সুন্দর মীমাংসা দিয়াছিলেন। আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আলোক কি এবং আলোক সম্বন্ধে আমরা কি জানি তাহা বলিয়া লইলে আলোচ্য বিষয়টি বুঝিতে কিছু সুবিধা এবং সাহায্য হইবে।

সকলেই জানেন যে আলোক কি, ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে বহুদিন হইতে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং অবশেষে বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরীক্ষা এবং তর্কের পর স্থির করিয়াছেন যে আলোক এক প্রকার কম্পন। কিসের কম্পন? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া ঈথর নামক এক প্রকার পদার্থ আছে, আলোক সেই ঈথরেরই কম্পন। এখন আলোক যদি কেবল ঈথরের কম্পন বা তরঙ্গ হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই বাধা অতিক্রম করিতে পারিবে, যেমন আমরা জানি যে বায়ুর তরঙ্গ যে শব্দ সে বাধা অতিক্রম করিতে পারে। ইহা সকলেরই জানা কথা, যে যখন আমরা এক ঘরে বসিয়া কথা বলি তখন অন্য ঘর হইতে শুনা যায় অর্থাৎ বায়ুর তরঙ্গ প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ প্রাচীর ঘুরিয়া অন্য ঘরে যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পার্ব্বত্য দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে দুইজন লোক হয় ত খুব নিকটে আছেন, মাঝে কেবল একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গের ব্যবধান, কিন্তু একজন আর একজনকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও তাহা শুনা যায় না। ইহার কারণ বায়ুর তরঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বৃহৎ বাধা অতিক্রম করিতে পারে না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে। আপনারা হয় ত অনেকে দেখিয়াছেন এবং অনেকে শুনিয়াছেন যে সকল প্রসিদ্ধ বন্দরেই, আসল বন্দরের স্থান এবং উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে একটা কঠিন প্রাচীর থাকে—তাহাকে Breakwater বলে। সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গগুলি এই ব্রেকওয়াটারের উপর লাগিয়া প্রতিহত হয়। কিন্তু সমুদ্র যখন উদ্দাম হইয়া উঠে, এবং তরঙ্গগুলিও খুব বড় বড় হয়, তখন এই ব্রেকওয়াটার আর সব তরঙ্গগুলিকে ফিরাইয়া দিতে পারে না, কতকগুলি ব্রেকওয়াটার ডিঙ্গাইয়া বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তরঙ্গের অনুপাতে বাধা যদি বড় হয় তবে তরঙ্গ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, বাধা সামান্য হইলেই পারে।

আমরা সচরাচর দেখি যে আলোক অতি ক্ষুদ্র চুলপরিমাণ বাধাও অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু তাহা হইতে আমরা এ কথা বলিতে পারি না যে আলোক, কতকগুলি তরঙ্গপরম্পরা নয়; বরং আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসিতে পারি যে আলোকের তরঙ্গ এত ক্ষুদ্র যে চুলের বাধাও তাহার পক্ষে পর্ব্বতসমান। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, অতঃপর ডাক্তার ইয়ঙ্গ (Young) পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন যে ঈথরতরঙ্গ যথার্থই বায়ু এবং জলের তরঙ্গের ন্যায় বাধা অতিক্রম করে। তাঁহার এই পরীক্ষার পর আলোক-তরঙ্গের মত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার পর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা আলোকসম্বন্ধে অনেক তথ্য বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপিয়াছেন এবং বাহির করিয়াছেন যে সাদা আলোকের মধ্যে বেগুনি, ইণ্ডিগো, নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা ও লাল এই যে সাতটি রঙের আলোক আছে, ইহাদের মধ্যে বেগুনি আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সকলের অপেক্ষা ছোট, তাহার পর ইণ্ডিগোর তরঙ্গ, তাহার পর নীল, তাহার পর সবুজ, তাহার পর কমলা, তাহার পর হল্‌দে এবং লাল আলোক-তরঙ্গ সকলের অপেক্ষা বড়।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে বেগুনি কিম্বা ইণ্ডিগো কিম্বা নীল আলোক-তরঙ্গের পক্ষে যাহা বাধা, হলদে বা কমলা রঙের বা লাল আলোকের পক্ষে তাহা বাধাস্বরূপ নাও হইতে পারে।

এইবার আমরা লর্ড রেলি সাহেব আকাশের নীল রং হওয়া সম্বন্ধে যে মীমাংসা দিয়াছেন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইব। তিনি মনে করেন আকাশে খুব ছোট ছোট কণাসকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে; এই কণাগুলি যদি আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ছোট হয়, তবে যখন সূর্য্যালোক ইহাদের উপর পড়িবে তখন হলদে লাল প্রভৃতি বড় বড় আলোকতরঙ্গগুলি ইহাদের বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিবে, কিন্তু বেগুনি, নীল প্রভৃতি ছোট ছোট আলোকতরঙ্গগুলি ইহাদের উপর পড়িয়া প্রতিহত হইবে এবং নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। এখন কণাগুলি নানা অবস্থায় থাকার দরুণ, ইহাদের পৃষ্ঠে নানাভাবে প্রতিহত এবং বিক্ষিপ্ত আলোকের এক অংশ আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছিবে। অতএব দেখিতেছি মহাশূন্য হইতে যে আলোক আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় সে আলোক এই কণাগুলির পৃষ্ঠে নানা ভাবে প্রতিহত বেগুনি, ইণ্ডিগো, নীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন আলোক-তরঙ্গ হইতেই পারে না।

এখন ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল, মহাশূন্য হইতে যে আলোক আসিবে তাহাতে হলদে, কমলা বা লাল রং আদবেই থাকিতে পারে না, কেবল বেগুনি, ইণ্ডিগো এবং নীল রঙেরই প্রাধান্য থাকিবে। এখন এই প্রশ্ন উঠিবে, তবে আকাশের রং নীল দেখায় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক যখন কোন স্বচ্ছ মিডিয়মের মধ্য দিয়া যায়, তখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। সুতরাং বেগুনি, ইণ্ডিগো এবং নীল তরঙ্গের আলোক যখন একত্র হইয়া স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আসে, তখন বেগুনি এবং ইণ্ডিগো আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নীল অপেক্ষা অল্প বলিয়া, ইহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়, কেবল নীল আলোক-তরঙ্গ বেশীমাত্রায় আসিয়া পৌঁছায় এবং সেই জন্য আমরা আকাশকে নীল দেখি।

উপসংহারে কেবল এই কথাটি আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে এই সমস্ত ব্যাপারগুলি পৃথিবী হইতে খুব দূরে যে ঘটিতেছে তাহা নহে, কারণ ভাসমান কণাগুলি নিশ্চয়ই পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে নয়, বরং বাতাসের শেষ স্তরের অনেক নীচে।

শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

স্বরলিপি।

মিশ্র বেহাগ—ঝম্পক।

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে,
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে,
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো,
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে!
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে,

তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে!
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´
[পা পা মা] ২ ১´ ২ ১´ ২
II সা গা মা। গা গা I গা গা গা। গা মগা I রা গা পা। -া -মগা I
এ ম নি ক রে ঘু রি ব দু রে০ বা হি রে ০ ০০

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I গমা -মপা মা। গা রা I সা সা সা। ন্া -া I ন্া সন্া সা। -ন্া -পা I [ ] I
আ০ ০র্ ত গ তি না হি রে মো র্ না হি০ রে ০ ০

১´ ২ ১´ ২ ১´
II {পা পা পা। না না I না র্সা র্সা। র্সা র্সা I না র্সা র্রর্রা।
যে প থে ত ব র থে র রে খা ধ রি য়া০

২ ১´ ২ ১´ ২ ১´
। -র্সর্সা -া I গর্সা র্সা র্সা। র্গর্রা র্সা I না র্সা নর্সনা। নধা পা I নধা র্সা না।
০০ ০ আ প না হ তে কু সু ম০ উ০ ঠে ভ০ রি য়া

২ ১´ ২ ১´ ২ ১´
। -া -া} I র্সা -র্গা র্রা। র্সনা র্সা I না -া নধা। পক্ষা পা I সা রা গা।
০ ০ চ ০ ন্দ্র ছু০ টে সূ ০ র্য্যা০ ছু০ টে সে প থ

২ ১´ ২ ২
। গা গমা I রা মপা পা। ক্ষা পা I পক্ষা পনা নধা। পক্ষা পা I
ত লে০ প ড়ি ব লু টে স০ বা০ র০ পা০ নে

১´ ২ ১´ ২ ১´
I ক্ষা পধা পা। মা গা I গরা গা মা। -া -া I গমা -পধা পধপা।
র হি০ ব শু ধু চা০ হি রে ০ ০ আ০ ০র্ ত০

২ ১´ ২ ১´ ২
। মা মা I গা গা গরা। সন্া -া I ন্া সন্া সা। -ন্া -পা I [ ] I
গ তি না হি রে০ মো০ র্ না হি০ রে ০ ০

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
II {সা সা সা। ন্া ন্া I সা রা গা। গা মগা I রা মা গা। -া -া I
তো মা র ছা য়া প ড়ে যে স রো০ ব রে গো ০ ০

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I গা পা পা। মা মা I গা গা রা। সা সা I ন্া ধন্া সা। -া -া I
ক ম ল সে থা ধ রে না না হি ধ রে গো • •

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I পা পা পক্ষা। পা -া I পা পা পা। পক্ষা পা I পা না না। ধা পা I
জ লে র॰ ঢে উ ত র ল তা॰ নে সে ছা য়া ল য়ে

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I পক্ষা পপধা পধপা। মা গা I গা গা গা। গা গা I গা গা গা। গা মগা I
মা॰ তি॰॰ ল॰ গা নে ঘি রি য়া তা রে ফি রি ব ত রী॰

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I রা গা পা। -া -মগা I গমা -মপা মা। গা গা I রগা গা রা। সা -া I
বা হি রে • •• আ॰ •র্ ত গ তি না হি রে মো র্

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I ন্া ন্া সা। -া -া } I { পা পা পা। না না I না র্সা র্সা। র্সা র্সা I
না হি রে • • যে বাঁ শী থা নি বা জি ছে ত ব

১´ ২ ১´ ২ ১´
I র্সা র্সনা র্রর্রা। -র্সর্সা -া I পর্সা র্সা র্সা। র্গর্রা র্সা I না র্সা নর্সনা।
ভ ব॰ নে॰ •• • স হ সা তা হা শু নি ব॰

২ ১´ ২ ১´ ২ ১´
। নধা পা I নধা র্সা না। -া -া } I র্সা র্গা র্রা। র্সনা র্সা I না নাঃ -ধঃ।
ম॰ ধু প॰ ব নে • • তা কা য়ে র॰ ব ঘা রে র্

২ ১´ ২ ১´ ২
। পক্ষা পা I সা রা গা। গা গমা I রা রপা পা। ক্ষা পা I
পা॰ নে সে তা ন থা নি॰ ল ই য়া কা নে

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I পক্ষা পনা নধা। পক্ষা পা I ক্ষা পধা পা। মা গা I গরা গা মা। -া -া I
বা॰ জা॰ য়ে॰ বী॰ গা বে ড়া॰ ব গা ন গা॰ হি রে • •

১´ ২ ১´ ২ ১´
I গমা -পধা পধপা। মা মা I গা গা গরা। সন্া -া I ন্া সন্া সা।
আ॰ •র্ ত॰ গ তি না হি রে॰ মো॰ র্ না হি॰ রে

২
। -ন্া -পা II [ ] II
• •

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম কথা।

আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছি তাহাকে পর্য্যাপ্ত মনে করা ঠিক হইবে না, কারণ আমরা এ সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে গতবারে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে সারিয়াছি। এবারে ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বোধহয় অনেকে জানেন যে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে ইতিহাস সম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের হাতে দিতে অনেক শিক্ষকের আপত্তি আছে। তাহার প্রধান কারণ হর্বার্ট স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন যে, সে পাঠ্যপুস্তকগুলি "The mere tissues of names and dates and dead unmeaning events"—কেবল কতগুলি নাম আর তারিখ আর মৃত নিরর্থক ঘটনার জোড়াতাড়া। ইহা ছাড়া আর একটা বড় কারণ এই যে, পাঠ্যপুস্তক-লেখককে আবশ্যক অনাবশ্যক সকল ঘটনাই বিবৃত করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন বাচ্‌বিচার থাকে না। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল ইতিহাসের পুস্তক একটা ঘটনার পঞ্জিকার আকার ধারণ করে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের তাহা পড়িয়া কল্পনাবৃত্তির কোন স্ফুরণই হয় না, অতীত কালকে তাহারা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায় না। আর ইতিহাসের ঘটনাগুলির মধ্যে যে মানব-সমাজের উন্নতি অবনতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম সকল কাজ করিতেছে, ঐ তালিকাপাঠে বয়স্ক ছাত্রগণও তাহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হয় না।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎ সারজশুয়া ফিচ্ (Sir Joshua Fitch) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিতেছেন: "So unsatisfactory is the intellectual result of much of the labour spent on teaching history to children, that many authorities of great weight advocate the omission of the subject from the course of school instruction altogether"—। অবশ্য এই দ্বাদশ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর কেহই ইতিহাস শিক্ষা একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করে না। কিন্তু ফিচের লেখা হইতে বুঝা যায় যে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করানোর কত বড় কুফল প্রকাশ পাওয়াতে এক সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষার প্রধান অধিনায়কবর্গ ইতিহাসশিক্ষাটাই একেবারে উঠাইয়া দিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন।

তারপর ইংলণ্ডে যেন একসময়ে ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীনভাষা যাহাতে উঠিয়া না যায় তজ্জন্য classical association ক্লাসিক ভাষারক্ষার সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইতিহাস শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য historical association ঐতিহাসিক সমিতিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেম্ব্রিজ হইতে অক্সফোর্ড হইতে ইটন্ হইতে হ্যারো হইতে নানা শিক্ষকগণ একত্র হইয়া ইতিহাস শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল জ্ঞাপন করেন এবং এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা ইতিহাস শিক্ষার পাঠ্যসূচী (Syllabus) একেবারে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। সে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংক্ষেপে বলিতে গেলেও পুঁথি হয়। মোটামুটি এই বলি যে নীচের ক্লাসে তাঁহারা সকলেই মুখে মুখে ইতিহাস গল্প করিয়া বলিবার পক্ষপাতী। ছবি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, ম্যাপ প্রভৃতি সেই মৌখিক গল্পের স্ফুটনে সাহায্য করিয়া থাকে। তারপর প্রধান প্রধান ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে, যেখানে বড় বড় ঘটনা অভিনীত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বালক বালিকাগণকে ভ্রমণ করাইয়া ইতিহাসকে সজীব ও প্রত্যক্ষ করাইবার চেষ্টাও ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ভ্রমণ সম্ভবপর না হইলেও ইংলণ্ডের যে কোন জায়গায় ইংলণ্ডের ইতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা বুঝাইবার মত মালমসলা পাওয়া যায়। যেমন ধর অক্সফোর্ডে, রোমান শাসনকাল বুঝাইবার জন্য রোমান রাস্তার অবশেষ একটুখানি আছে, নর্ম্মান কাল বুঝাইবার জন্য Iffley নামক সন্নিকটস্থ গ্রামে একটা প্রাচীন নর্ম্মাণ গির্জ্জা আছে, ইংলণ্ডীয় রেনেসাঁসের কালে অষ্টম হেনরির সময়ে তো ক্রাইষ্ট চার্চ্চ প্রভৃতি কলেজই অক্সফোর্ডে স্থাপিত হইয়াছে—অষ্টম হেন্‌রি যেখানে বসিয়া ডিনার খাইয়াছিলেন, সেই ডিনার হল অদ্যাপি বিদ্যমান। এইরূপে এত উপকরণ যে কোন য়ুনিভার্সিটি সহর বা পুরাতন স্থানে পাওয়া যায় যে ইতিহাসের স্থানিক ঔৎসুক্য জাগ্রত করা কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না। তারপর আজকাল ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাট্য এবং ঐতিহাসিক বীরদের জীবনচরিত এত রাশি রাশি বাহির হইয়াছে যে যেমন যেমন যে যে কালের ইতিহাসের গল্প ছাত্ররা শুনিতেছে, অমনি তাহাদের হাতে সেই সেই কালের কোন উপন্যাস বা নাট্য বা কোন বীরের জীবনচরিত দেওয়া হইতেছে এবং এইরূপে ইতিহাস একেবারে তাহাদের তরুণ মনে গাঁথা হইয়া যাইতেছে। নীচের ক্লাসে সর্ব্বত্রই ইতিহাস শিক্ষার এতগুলি সুপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এইসঙ্গে আমার আর একটু বলা কর্ত্তব্য যে একেবারে সেই গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত খুঁটি নাটি ব্যাপার-শুদ্ধ ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলাও আজকালকার ইতিহাস শিক্ষার সুপ্রণালী বলিয়া বিবেচিত হয় না। নীচের দিকে যে প্রণালী অধুনা অবলম্বিত হয় তাহার নাম Concentric method অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে ক্রমে পরিধির দিকে ব্যাপ্ত হইবার প্রণালী। প্রথমে বড় বড় পর্ব্বের একটা মোটা সাধারণ পরিচয় দাও, তারপর সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ডালপালার বিস্তার কর। High roads to history প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক এই প্রণালীতে লিখিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এই উপায়ে, এমন কি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে সমস্ত ইউরোপের ইতিহাস সেখানকার শিক্ষকগণ জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নীচের ক্লাসে ইতিহাসের অধ্যাপনায় আধুনিক এই সকল প্রণালীর সঙ্গে আমরাও যথাসাধ্য যোগ রাখিয়া চলিবার চেষ্টা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে করিয়া থাকি। অস্কার ব্রাউনিং শিক্ষাবিভাগে অধিনায়কতার কালে ভাল অধ্যাপনার যে একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা এই যে, শিক্ষক প্রত্যেক বক্তৃতাটি প্রস্তুত করিয়া আসিয়া ক্লাসে যখন প্রদান করিবেন তখন ছাত্ররা তাহার নোট লইবে এবং পরে সেই নোট অবলম্বনে বক্তৃতার সারাংশ সুন্দররূপে লিখিয়া তাঁহার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে নীচের ক্লাসগুলিতে বরাবর আমরাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি। তবে ম্যাজিক লণ্ঠন, ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি উপকরণের সাহায্য আমরা কোথায় পাইব, এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও নাট্য প্রভৃতি পড়ানো ও অভিনয় করানোও আমাদের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সেরূপ শিশুসাহিত্য এদেশে কোথায়? ইতিহাসকে তাহার ক্ষেত্রে পড়াইবার সুযোগও আমাদের নাই। আমরা কেবল গল্প করিয়া করিয়া ইতিহাসে ছাত্রদের মনে একটা ঔৎসুক্য জন্মাইবার চেষ্টা করি এবং ছাত্রদের দ্বারা প্রত্যেকটি পাঠ লেখাইয়া তাহাদের স্মরণে সেই কাহিনীগুলি মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করি মাত্র। যে ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অধিক সেখানে লেখানোও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় "The historical teacher needs literary culture and some power of narrative and description"—ঐতিহাসিক শিক্ষকের সাহিত্যজ্ঞান এবং বর্ণনার ক্ষমতা দুইই থাকা চাই—যে সকল শিক্ষকের তাহা আছে তাঁহারাই এ প্রণালীতে কৃতকার্য্য হন, যাঁহাদের নাই তাঁহারা কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারেন না।

ইংলণ্ডে গত ছয় বৎসর হইতে widening of the history syllabus—ইতিহাস শিক্ষাসূচীর প্রসার কল্পে শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন ও চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক জায়গায় আজকাল শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়া হয় না, সমস্ত জগতের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে ছাত্রদিগকে বলিবার চেষ্টা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়েও কয়েক বৎসর হইতে সেইরূপ একটা চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অবশ্য নীচে হইতে উপরের ক্লাস পর্য্যন্ত ঐ ক্রমশঃ ব্যাপ্তিশীল প্রণালীতে পঠিত হয়, তদ্ব্যতীত ঈজিপ্ট ব্যাবিলন গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, মুসলমানগণের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস (ব্যাপক প্রণালীতে) এখানে পড়ানো হইয়া থাকে।

তবে কেবল গল্প করিয়া বলিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন প্রণালীই আমরা অবলম্বন করিতে পারি নাই। বাংলায় ইতিহাসের অধ্যাপনা হয় বলিয়া ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজীতে লিখিত নানা পুস্তক ছাত্রদিগের দ্বারা পড়াইয়া লওয়াও চলে না। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের যথেষ্ট উন্নতি করিবার আছে। তবে পাঠ্যপুস্তকবিভীষিকা হইতে ছাত্রদিগকে পরিত্রাণ করা হইয়াছে ইহা একটা সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। High roads series এর মত উত্তম পাঠ্যপুস্তক লিখিত হইলে পাঠ্যপুস্তক গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিত না। বোধ হয় কিয়ৎ কালের মধ্যেই কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক এখানে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। তবে গল্প বলার আনুষঙ্গিক যে সকল শিক্ষার উপায় ইয়োরোপে উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি না গ্রহণ করিলে ইতিহাস শিক্ষা কখনই ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়।

নীচের ক্লাসের ইতিহাস অধ্যাপনা সম্বন্ধে আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে উচ্চক্লাসের ইতিহাস অধ্যাপনা সম্বন্ধে সে দেশে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঃ—

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

(১)

গুটিপোকা ও প্রজাপতি।

আমরা এত ভিন্ন ভিন্ন জাতের গুটিপোকা আবিষ্কার করিতেছি যে তাহাদের নামকরণ করা মুস্কিল। পতঙ্গতত্ত্বের পুস্তকে নিশ্চয় তাহাদের নাম আছে কিন্তু আমরা সে সব কিছুই জানি না বলিয়া যে গাছে যে গুটিপোকা

দেখি সেই গাছের নামে নামকরণ করিব। আজ যে নূতন এক শ্রেণীর গুটিপোকার কথা বলিতে যাইতেছি সে সন্ধ্যে ফুলের গাছে থাকে এবং তাহার পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। সুতরাং ইহাকে সন্ধ্যেগাছের গুটি-পোকা বলিব। সাধারণ গুটিপোকার শরীরের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই—ইহাদেরও দেহে সেই রকম গোল গোল চক্রাকৃতি মাংসদমষ্টি দেখা যায়। কেবল ইহাদের পশ্চাদ্ভাগের চক্রটিতে একটি ছোট লেজের মত থাকে। ইহাদের শরীরের আয়তন সওয়া ইঞ্চির বেশি নয়। ইহাদের গলার কাছে ছয়টি সূক্ষ্ম পা আছে তাহা অনেকটা চেলা বিছার পায়ের মত। ইহাদের পা এত সূক্ষ্ম যে গণনা করা শক্ত—তথাপি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৬টি পা গণিয়াছি। ইহাদের দেহের বর্ণ শৈশবে হরিতাভ থাকে কিন্তু জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের বর্ণ কেবলই বদলাইতে থাকে। হরিতাভ বর্ণের পর গাঢ় সবুজবর্ণ হইতে দেখিয়াছি। তার পর কিছু কাল পরে রক্তবর্ণ হইতে দেখিয়াছি। সে একেবারে শেষ অবস্থায়। তখন ইহারা আহারবিহার বন্ধ করিয়া শুষ্ক তৃণের সন্ধান করিতে থাকে, এবং তাহার সংস্থান হইলে নিজের মুখ হইতে এক প্রকার আঠা বাহির করিয়া নিজের আশে-পাশের ঘাস ও তৃণসমূহকে জোড়া দিয়া বাঁধিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ একটি চমৎকার আবরণ প্রস্তুত হইয়া যায়। আবরণটি একেবারে নিশ্ছিদ্র হইয়া যায়। বোধ হয় ইহা নির্ম্মাণ করিবার প্রধান কারণ ঝড়বৃষ্টি ও ইহাদের শত্রু পিপীলিকা প্রভৃতি পতঙ্গদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া। আবরণের ভিতর আবার সাপের খোলসের মত রক্তবর্ণ চর্ম্মকে ইহারা পরিত্যাগ করে এবং তখন ইহাদের বর্ণ দুগ্ধের মত শুভ্র দেখিতে হয়। ইহার লেজও থাকে না এবং পা-গুলির অস্তিত্বও যেন প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর পোকাটি সঙ্কুচিত হইতে হইতে অনেকটা নারকলে কুলের বীচির আকার ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের শ্বেত চর্ম্মটিও তাহার আবরণের স্বরূপ হইতে থাকে। তখন আবার রং বদলায়। চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত হইতে বাদামি রঙে পরিণত হয়। পোকাটিকে তখন আর দেখা যায় না, কেবল উপরের চর্ম্মাবরণটা দেখা যায়। তাহা তখন মাছের আঁশের মত দৃঢ় হয়, পিপীলিকা কি অন্যান্য শত্রু সহজে তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। চর্ম্মাবরণের উপরে দুই পাশে চারিটি চারিটি করিয়া আটটি কালো কালো ফোঁটার দাগ হয়, একেবারে পশ্চাতে একটি ছোট কালো রঙের কাঁটা দেখা যায়। তখন এই আবরণের মধ্যে পোকাটি দিনে দিনে প্রজাপতির আকার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এগার দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া চর্ম্মাবরণটি খুব কালো আর নরম হইয়া যায়, এত নরম হয় যে হাত দিয়া ধরিতে অসুবিধা হয়। তার পর একদিন তাহার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি বাহির হয়।

প্রজাপতি।

এই প্রজাপতিটি নূতন ধরণের। ইহার আকার ও আয়তন অনেকটা বড় ডাঁস মাছির মত। ইহাদের মাথা ও মুখের অংশের আকার ক্ষুদ্র এবং অনেকটা শিশু ইঁদুর-ছানার মুখের মত। অন্য প্রজাপতি হইতে ইহাদের প্রভেদ এই যে ইহারা লেজবিশিষ্ট। লক্কা পায়রা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তাহার পুচ্ছ কেমন সুন্দর। ইহাদের পুচ্ছ ঠিক সেই রকম, ছড়ান—অনেকটা মেয়েদের পদ্ম খোঁপার মত গোল ও মনোহর। আবরণ হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ইহারা স্বীয় পক্ষ চতুষ্টয়কে ঘন ঘন স্পন্দিত করিতে থাকে, সেই স্পন্দনের ফলে ইহাদের সঙ্কুচিত পক্ষগুলি প্রশস্ত হইয়া যায়। তখনই ইহারা উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে।

সুধাকান্ত।

---

(২)

মাকড়সা।

মাকড়সা যে কি রকমের কীট তাহা কেহই অবিদিত নহেন। ইহারা আমাদের দেশে, ঘরে, গাছে, গর্ত্তে, দেওয়াল প্রভৃতি স্থানে জাল বুনিয়া বাস করে।

ইহাদের জাল বুনিবার কৌশল অতি আশ্চর্য্য। এক প্রকার রস দিয়াই ইহারা জাল বোনে। এই রস কোথা হইতে আসে তাহা বলা উচিত। জাল নির্ম্মাতা মাকড়সাদের পেটের নীচে, গরুর বাঁটের ন্যায় প্রায় পাঁচ ছয়টি করিয়া বাঁট থাকে। তাহা হইতেই এই রস বাহির হইয়া থাকে ও তাহাই শুকাইয়া সুতায় পরিণত হয়।

ধর যদি তাহারা দুই গাছের মাঝখানে জাল বুনিতে চায়, তবে ইহারা যে গাছে আছে সেই গাছের কোন একস্থানে সেই রস জড়াইয়া অবিরত সুতা ছাড়িতে থাকে। তাহার পর সেই সুতা অপর গাছে লাগিয়া যায়। তাহার পর ত জাল-বিস্তার অতি সহজ হইয়া যায়—সেই নির্ম্মাতা সুতা দিয়া আবার পূর্ব্ব গাছটিতে যায়, ও সেই সুতাটি দোহারা করিয়া বুনিয়া ফেলে। এই রকম বার বার যাতায়াত করিয়া জালের খুঁটিগুলি

তৈয়ারী করে। এস্থলে এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে—যে রস ত তরল, তাহা সুতার মত হয় কেমন করিয়া? ব্যাপারটা এই যে ঐ অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকার রসই বাতাসে শুকাইয়া অল্প সময় মধ্যেই সুতায় পরিণত হয়।

আমরা সচরাচর যে মাকড়সার জালের সুতা দেখি, উহা একটি সুতা নহে—অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতার সমষ্টি মাত্র। মাকড়সাদের জাল বুনিবার প্রণালী বড়ই চমৎকার। একটু মন দিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা, কি একঘণ্টার মধ্যেই সে সমস্ত জালটি বুনিয়া ফেলে।

জালটি হইয়া গেলে, মাকড়সা জালের মধ্যে বসিয়া থাকে। কারণ সে জালের সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জাল না বুনিতে পারিলে ইহাকে অনাহারে মারা পড়িতে হয়। ইহাদের জালে কোন কীট পড়িলে, উহা আটকাইয়া যাইবামাত্র জালটি নড়িতে থাকে। আবার কোন কোন মাকড়সা জালের মধ্যস্থান হইতে একটী মোটা সুতা মুখে করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে—ও কোন দ্রব্য পড়িলে সেই সুতাটিতে টান দেয়, যদি তাহা কোন কীট হয়, তবে পুনরায় জালটি নড়িতে থাকে—ও তখন মাকড়সাটি শীকার জানিতে পারিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়—ও তাহাকে ধরিয়া মুখ দিয়া তাহার শরীরের ভিতর একপ্রকার বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়। পোকাটি সেই বিষে কিছুক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায়। মরিয়া গেলে মাকড়সাটি তাহাকে ক্রমাগত সেই রস দিয়া জড়াইতে থাকে। অবশেষে জড়াইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয়। সময় মত তাহাকে ভক্ষণ করে। কিন্তু যদি পোকাটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তবে ক্রমাগত জাল দিয়া তাহাকে জড়াইতে থাকে, অবশেষে পোকাটি নিস্তেজ হইয়া পড়িলে—তাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলে। এবং পোকাটি যদি বিশেষ বড় হয় (যথা বোলতা ভিমরুল) তবে তাড়াতাড়ি জাল কাটিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, না দিলে সেই পোকা জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাকড়সারা ঘরে, গাছে, গর্ত্তে প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করে।

যাহারা গর্ত্তে বাস করে, তাহারা গর্ত্তেই ডিমপাড়ে; ও ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার কিছুদিন পরে মাকড়সাটি মারা যায়, এই শ্রেণীর মাকড়সারা গর্ত্তের মুখে একটি জাল রচনা করে, ও কোন কীট তাহাতে পড়িলে ধরিয়া খায়। ইহাদের একটি সুবিধা আছে—কোন বহিঃশত্রু আক্রমন করিলে, তাড়াতাড়ি তাহারা গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় আর এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটির নীচে থাকে, তাহাদের বাসার সম্মুখে একটি করিয়া ঢাকুনি থাকে। ইহারা দিনে বাহির হয় না, কারণ তাহাদের অনেক শত্রু আছে, রাত্রিকালে বাহির হইয়া আহার অন্বেষণ করে।

ভিন্ন জাতির মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন রকমে ডিম পাড়ে, কেহ কেহ একটি আবরণ করিয়া তাহার ভিতর তাহার ডিম পাড়ে। কোন কোন মাকড়সা এই ডিম্বাবরণ নিজের সঙ্গেই রাখে, কোন জায়গায় পাড়ে না। যে মাকড়সারা ডিমের থলিটি মুখে করিয়া বেড়ায় তাহারা জাল রচনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। সম্মুখে কোন কীট দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া খায়, আর কোন কোন মাকড়সা এক জায়গায় ডিম পাড়িয়া তাহা পূর্ব্বকথিত রস দিয়া চাপা দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেক মাকড়সাই পাখীদের মত ডিমে তা দিতে থাকে, এইরূপ তা দিতে দিতে কোন কোন ডিম পনের ষোল দিনে, ও কোন কোন ডিম কুড়ি একুশ দিনে ফোটে। যে দিন ডিম ফোটে, সেই দিন তাহা দেখিতে ভারি মজা! নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন হু হু করিয়া জল বাহির হয়, তেমনি ডিমের কোন অংশে ছিদ্র হইলে অজস্র অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা বাহির হইতে থাকে। মাকড়সাগুলি বাহির হইয়া যে যেদিকে পারে চলিয়া যায়, ও অবশেষে নিজের জীবনধারণের জন্য ব্যবস্থা করে। এমন অনেক মাকড়সা আছে যাহারা বাঘের মত আক্রমণ করিয়া কীটাদি ধরিয়া খায়। শুনিয়াছি এক জাতীয় মাকড়সা পাখী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তুও ধরিয়া খায়। তাহাদের গাত্রে খুব লোম আছে, ও দেখিতে বৃহৎ। কোন কোন মাকড়সা এক একটি বাসার ভিতর প্রায় ২৯৩০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ প্রায় ৪১৫টি বাসা পরস্পর ঝুলাইয়া রাখে। এই বাসাগুলির আবরণ সাধারণতঃ সবুজ।

এক জাতীয় মাকড়সা জলের উপর বাস করে, অর্থাৎ পদ্মপাতা, শেওলা প্রভৃতি তাহাদের আশ্রয়। জলে বেড়াইবার জন্য ইহারা কাট কুটা দিয়া একটি নৌকা তৈয়ারী করে, ও তাহাতে চড়িয়া জলচর ছোট ছোট কীটাদি ধরিয়া খায়।

প্রবোধ

পরিণতি।

জীবনটি ত নয়কো শুধু
ফুলের মত ফোটা,
ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার
যুক্ত থাকে বোঁটা।
গন্ধে তাহার ভুবন ভরে
মুগ্ধ করে প্রাণ,
রসে জীবন সিক্ত করে
তৃপ্তি করে দান।
গন্ধ রসের সমাবেশে
ভুবন ভরা রয়,
কে জানে এই ফুলের ফলের
গোপন পরিচয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	...	১০৲
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৲
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৲
" সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৲
" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৲
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৲
শ্রীমতী অতসী দেবী	...	২৲
" সৌদামিনী দেবী	...	২৲
" প্রতিমা দেবী	...	২৲
" সরোজিনী দেবী	...	২৲
" সুহাসিনী দেবী	...	২৲
" সাহানা দেবী	...	২৲
" ইরাবতী দেবী	...	২৲
" অলোকা দেবী	...	২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	...	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৲

সম্পাদক পরিবর্ত্তন।

আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিগণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় রবিবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

IMPERIAL LIBRARY

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথের **"জীবন-স্মৃতি"** বহুলপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের নানাস্থানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাইশ খানি একেবারে নূতন ধরণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানিকে কাগজে, চিত্রে, ছাপায়, বাঁধাই—সকল দিকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রকাশক চেষ্টার ও অর্থব্যয়ের কোনো ত্রুটি রাখেন নাই।

"জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে কবিজীবনের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তাহাকে আরো স্পষ্ট, আরো সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে কবিবরের লিখিত বহুদিনসঞ্চিত রাশিকৃত চিঠিপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া **"ছিন্নপত্র"** নামে একখানি গ্রন্থও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাংলা দেশের বাংলাকবির যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থ দুইখানিতে পাওয়া যাইবে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ দুইখানির আদর হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জীবন-স্মৃতির মূল্য ৫৲ টাকা ও ছিন্নপত্রের মূল্য ৩৲ টাকা।

বিশেষ সুবিধা—৩০শে আশ্বিন মধ্যে দুইখানি পুস্তকের জন্য আদেশপত্র একনামে একত্র পাঠাইলে ৮৲ আট টাকা স্থলে ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকায় দেওয়া যাইবে।

নিম্নে আদেশপত্র দেওয়া হইল। অবিলম্বে উহা প্রেরণ করুন।

আদেশপত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু—

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত দুইখানি, গ্রন্থ "জীবন-স্মৃতি" / "ছিন্নপত্র" .... সেট্ ভি-পি-তে / লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—

১৩১ সাল, তারিখ ....।

নাম————————————

ঠিকানা————————————

দ্রষ্টব্যঃ—আগামী ৩০শে আশ্বিন মধ্যে প্রকাশকের নিকট একনামে দুইখানি গ্রন্থের আদেশ পত্র পৌঁছিলে ৮৲ টাকা স্থলে ৬॥০ টাকায় দেওয়া যাইবে। কলিকাতার অর্ডার লোকমারফৎ ও মফস্বলের অর্ডার ভি-পি-তে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
* আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
* ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
* ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	৷০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷০
* সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
* বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷০
* বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
* ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০
* কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
* আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
* পরলোক ও মুক্তি	৵০
* দশোপদেশ	॥০
* মাঘোৎসব	॥০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (২য় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা)	২৷০
কাগজে বাঁধা	১৸০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵০
* ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য়ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০
* আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	৷০
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
* হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	৷০
ধর্ম্মমাল	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	৷০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন (প্রতি খণ্ড)	৷০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৸০
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	॥৵০

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া যাইবে।

শান্তি ঔষধালয়।

সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের

বৃহৎ কারখানা।

বিশুদ্ধ খাঁটী কবিরাজি ঔষধ আশ্চর্য্য সস্তা, চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৩৲, স্বর্ণসিন্দুর ১ ভরি ৫৲ টাকা, কামেশ্বর মোদক /১ সের ৪৲, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত /১ সের ১২৲ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নিকট পত্র লিখিলেই ক্যাটলগ, ব্যবস্থা বা ঔষধ যাহার যাহা আবশ্যক অতি সত্বর পাইবেন।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ—"অনন্তমূলাসব সালসা"—মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৸০ বার আনা।

অর্ডারদাতাগণ আমার নিজ নামে অর্ডার দিবেন এবং আমার নামটি পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতানন্দ গুপ্ত, কাব্যবিনোদ,

পটুয়াটুলী, ঢাকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৯ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

আলো-ছায়া।

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কি আছে, কি চাহে নিতে!
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে জানি,
নিয়ে যায় বহি' মেঘ-আবরণ খানি
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে॥
নব নব রূপে বরণে বরণে ভরি
বুকে লও তুলি, সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল শ্যামল কোমল কালো
হে নিরঞ্জন, তাই বাস তারে ভালো
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে॥

লণ্ডন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেলা ও কাজ।

ভূমধ্যসাগরের প্রথম ঘাট পোর্টসৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে য়ুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। সহরের বাতায়ন গুলিতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোট ছোট নৌকা এবং মোটর বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্টসৈয়দের দোকান বাজার ঘুরিবার জন্য অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ—দুইয়ের সঙ্গমস্থলে অল্প একটু-খানি জায়গায় মানুষ আপনার আলো কয়টি জ্বালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্টসৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে কিন্তু নূতন মানুষ! এমন উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে ত কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্যের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মত এমন ভিড় আর নাই।

পোর্টসৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসী। আমাদের ডেক এখন মানুষে মানুষে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ডেকের উপর য়ুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালযাপন আমি আরো কয়েকবার দেখিয়াছি এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনো মতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই—চোখের সামনে অন্য কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। চুপ কর, স্থির থাক, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না, ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন।

আর, ইহারা কেবলি বলে, একটা কিছু করা যাক্। এইজন্য ইহারা ছেলেবুড়া সকলে মিলিয়া কেবলি দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয় আমি যেন বাহ্যপ্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছেনা ;—তখন সে আপনার সেই উদ্বৃত্ত প্রাচুর্য্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোট ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি ; নহিলে তাহাকে শান্ত রাখা শক্ত হয়। কেন না, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এই জন্যই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারো কাহারো বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড় উপদ্রব হউক্, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরো গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে ইহাদের জন্যও কত রকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃক্‌পাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয়দিনের জন্য পথচলার মুখে এ সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু য়ুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মস্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে? তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই ; এইজন্য খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলি ছটফট এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ সমস্ত ছেলেমানুষি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়—কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসঙ্গত।

কিন্তু যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসঙ্গত তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্তকালের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যের মত। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কৃপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই কেননা এই খেলা অলসের কালযাপন নহে—কেননা আমরা দেখিয়াছি ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্ম্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্ম্মজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কি অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্ব্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্ম্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্ব্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্য্যকে বিজ্ঞের মত অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্য্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহু গুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে।

এই যে উদ্যত শক্তি, যাহার একদিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম্ম ইহাই যথার্থ সুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা একদিকে দেখি সাজসজ্জা লীলা-মাধুর্য্য, আর একদিকে দেখি অক্লান্ত কর্ম্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত শক্তিই সৌন্দর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে; আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলি কদর্য্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্য্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধসংস্কার ; এইখানেই মানুষ বলে আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে! এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আর দ্ধ

কর্ম্ম শেষ হয় না এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদআহ্লাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধূলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের আমোদপ্রমোদও কোনো-মতে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্র বেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে, সেই নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ আহ্লাদ এমন উচ্ছ্বসিত প্রবলবেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট, সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু যখনি সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনি সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়—সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায় কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজনমত চলিতাম। পোঁটলা পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহবা দাঁতন করিতাম, কেহবা যেখানে খুসি বিছানা পাতিয়া পথরোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহবা হুকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক্ একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহবা চাকরকে দিয়া শরীর ডলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিষপত্র কোথায় কি পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না এবং ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না। হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দুর্ব্বীণটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবি-লের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈস্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্য্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বীচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত—এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্ধ হাজারবার করিয়া খোঁজা-খুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য চারিদিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্ম্মের ত কথাই নাই। যে শক্তি কর্ম্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপ-নার তলোয়ারকে ভালবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে, তখন সে ভয়ে হোক্, লোভে হোক, বা কেবল-মাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ববশত হোক নিয়মকে নতজানু হইয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয় দুর্ব্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ

শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনাযুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এই জন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মত মানি, যেখানে মানিনা সেখানে দাসের মতই ফাঁকি দিই। সেই জন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত—যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি, নয় সরকার বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে কোন্‌টা যে কার্য্য এবং কোন্‌টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরের নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে,—যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিষ নহে ভিতরের জিনিষ, সুতরাং তাহা কাহারো কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ, আমরা, মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারলাভের বেলায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলি জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্ব্বলের অধিকারকে সঙ্কুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারো ভাল করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভাল করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভাল হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্ব্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈব সম্পত্তির মত লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে! বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা ইহাই আমাদের একটি মাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হোক মানিতেই হইবে কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনই তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনই তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনই বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে, সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদান্তবাদ

ষষ্ঠ প্রপাঠক

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীবল্লভদর্শন

(১)

আজ আমরা শ্রীবল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অন্যান্য ভাষ্যকারের ন্যায় ইঁহারও মতে ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই। ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিলে কোনো আপত্তির বিষয় থাকে না, কিন্তু উপাদান কারণ বলিলে নানা দোষের আশঙ্কা হয়। এইজন্য সকল বাদীকেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, এবং এই ব্যাখ্যার বিভিন্নতা তাঁহাদিগের মতকে পরস্পর বিভিন্ন করিয়াছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই যাহা কিছু রহিয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম; এই সমস্ত আত্মাই; এখানে নানা অর্থাৎ অনেক নাই; ইত্যাদি। অতএব আমরা সংসারে যাহা

কিছু দেখিতেছি, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার উক্ত হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ং নিজেকেই করিয়াছেন—"স আত্মানং স্বয়মকুরুত"; তাঁহা হইতেই এই সমস্ত হইয়াছে। অতএব এই নিখিল প্রপঞ্চের ব্রহ্ম কারণ, এবং ইহা তাঁহার কার্য্য। কারণ যেরূপ, কার্য্যও সেইরূপ হইবে। সূত্র রঞ্জিত হইলে তদুৎপন্ন বস্ত্রও রঞ্জিত হইবে; মৃত্তিকা কৃষ্ণ হইলে তদুৎপন্ন ঘটও কৃষ্ণ হইবে। অতএব ব্রহ্ম-ও জগৎ-সম্বন্ধেও এইরূপ; ব্রহ্ম যে-প্রকার, জগৎও সেই-প্রকার হইবে ব্রহ্ম যখন সৎ-, চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ, তখন এই জগৎও সৎ-, চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ। সুবর্ণ যেমন অ বি কৃ ত থাকিয়াই কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ অ বি কৃ ত থাকিয়াই জগদ্-রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণ কার্য্যকারণ-স্থলে এই প্রকার অ বি কৃ ত প রি ণা ম বা দ স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, কারণ অ বি কৃ ত থাকিয়াই কার্য্যরূপে প রি ণা ম প্রাপ্ত হয়, কারণের কখনো বিকার হয় না। * এইজন্যই তাঁহারা বলিতে বাধ্য যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মকে অবিকৃত থাকিয়াই তদাকারে পরিণত হইতে হইবে, এবং তাহা হইলেই জগৎকে সৎ,- চিৎ- ও আনন্দ-স্বরূপ না বলিলে চলে না।

যেমন এক সুবর্ণ বলয়-কুণ্ডলাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং বলয়-কুণ্ডলাদি সুবর্ণ ভিন্ন কিছু নহে, সেইরূপ এক ব্রহ্মই ঘট-পট তরু-লতাদি বিবিধ আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এবং তৎসমুদয় এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নহে। সবই ব্রহ্ম। ঘট-পট, তরু-লতা, পশু-পক্ষী সবই ব্রহ্ম; সবই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এ সব মায়িক বা মিথ্যা নহে, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে।

কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব? ঘট-পট, তরু-লতা, পশু-পক্ষী সবই ব্রহ্ম, এবং সবই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঘট জড়, ইহা যে চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ নহে, তাহা সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইহার একটা সত্তা আছে বটে, কিন্তু স্থির সত্তা নাই; ঘট আজ আছে, কাল তাহা থাকিবে না, তাহার ধ্বংস হইবে, অতএব ঘটকে বস্তুত সৎও বলিতে পারা যায় না, কেননা যাহা সৎ, তাহার অভাব হয় না—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" তাহা হইতেই ঘটকে অনিত্য বলিতে হয়, এবং তাহা অনিত্য হইলে কিরূপে তাহাকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে? আবার যদি ঘট-পট, তরু-লতা সবই ব্রহ্ম, তাহা হইলে ঘটও যাহা, পটও তাহা; ইহাদের পরস্পর কোনো ভেদ থাকে না। এবং তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তাহাদের কার্য্যেও কোনো ভেদ থাকিবে না, অর্থাৎ ঘটের দ্বারা যেমন জল অনয়ন করা যায়, পটেরও দ্বারা তাহা সেইরূপ করা যাইতে পারিবে; পটের দ্বারা যেরূপ কিছু আচ্ছাদন করা যায়, জলেরও দ্বারা সেইরূপ আচ্ছাদন করিতে পারা যাইবে। কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। বিশেষত ঘট ও পটের পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণ ইহার এইরূপ সমাধান করেন:—পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কার্য্য জগৎকে সচ্চিদানন্দ স্বীকার না করিলে চলে না! এ সম্বন্ধে যে দোষগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় বস্তুতই দোষরূপে পরিগণিত হইত,—যদি আমাদের মতে বস্তুত অনিত্য বলিয়া কিছু থাকিত,—যদি ভেদ বা অভাব বলিয়া বস্তুত কোন পদার্থ থাকিত। কোনো পদার্থ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তোমরা তাহার এক অভাব স্বীকার কর, এবং তাহার নাম দিয়াছ তোমরা প্রা গ ভা ব; ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকাতে ঘটের প্রা গ ভা ব আছে। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার অভাব হয়, এবং তোমরা ইহার নাম দিয়াছ ধ্বং সা ভা ব, কোন স্থানে ঘট না থাকিলে ঘটের সেই অভাবকে তোমরা অ ত্য ন্তা ভা ব বল। আবার ঘট পট হইতে ভিন্ন এই যে ভেদ, তাহা অ ন্যো ন্যা ভা ব। আমরা এই চতুর্বিধ অভাবের কোনটিকেই স্বীকার করি না। কেন করি না, তাহার যুক্তি আছে। আমরা উ ৎ প ত্তি ও বি না শ এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; ঘট উ ৎ প ন্ন হইয়াছে, অথবা বা বি ন ষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা সকলেই বলি। কিন্তু এই উৎপত্তি ও বিনাশ বলিতে বস্তুত কি বুঝা যায়? আ বি র্ভা ব ও তি রো ভা ব ভিন্ন কিছু নহে। বর্ত্তমান বস্তুর অনুভবের যোগ্যতার নাম আবির্ভাব, আর অনুভবের অযোগ্যতার নাম তিরোভাব। কোন বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে এই বুঝা যায় যে, তাহাকে অনুভব করিতে পারা যায়; আর যাহাকে অনুভব করতে পারা যায় না, তাহার তিরোভাব হইয়াছে।* মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইয়াছে,—ইহার অর্থ মৃত্তিকা হইতে ঘট আবির্ভূত হইয়াছে। অপর পক্ষে ঘট বিনষ্ট হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে ঘট স্বকারণে তি রো ভূ ত হইয়াছে। দুগ্ধে নবনীত থাকে, কিন্তু মন্থনের পূর্ব্বে তাহা আমরা দেখিতে পাই না; ইহার কারণ নবনীত সেই সময়ে দুগ্ধে তিরোভূত হইয়া থাকে; মন্থনের পরে তাহা

* বেদান্তদর্শন, অণুভাষ্য, ১. ৪. ২৪; প্রমেয়ার্ণব, প্রপঞ্চবিবেক; শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড, ১০।

* বিদ্বন্মণ্ডনে (কাশী-চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী) এ সম্বন্ধে মহান্ শাস্ত্রার্থ করা হইয়াছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা তখন তাহা আবির্ভূত হয়। সুবর্ণ বলয়-ও কুণ্ডল-রূপে প্রকাশ পায়। এখন যাহা বলয়, পরক্ষণে তাহাকে কুণ্ডল-রূপে আমরা দেখিতে পারি; আবার তাহা দ্বারা অপর কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে কুণ্ড না দেখিয়া সেই নূতন অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সুবর্ণে বলয়, কুণ্ডল ও অন্যান্য বহু অলঙ্কারই তিরোভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যখন যেটি আবির্ভূত হয়, তাহাই আমরা দেখিয়া থাকি, আর যে সমস্ত তিরোভূত থাকে, তৎসমুদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন, আমরা যে বলিয়া থাকি—বলয় কুণ্ডল নহে, তাহা কেবল ব্যবহারমাত্র, বস্তুত তাহাদের কোনো ভেদ নাই; কেননা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তাহারা তিরোভূত হইয়া রহিয়াছে; যে বলয়কে আমরা বলিতেছি ইহা কুণ্ডল নহে, এখনই তাহা কুণ্ডল হইয়া দেখা দিবে। অতএব এই নিয়মে সবই সব—"সর্ব্বং সর্ব্বময়ম্।"* ঘটও পট, পটও ঘট। ঘটে যেমন ঘটত্ব আছে, সেইরূপ পটত্ব-প্রভৃতিও রহিয়াছে। তবে ঘটত্ব যেমন আবির্ভূত, পটত্ব-প্রভৃতি সেরূপ নহে,—ইহারা তিরোভূত। পটত্ব-প্রভৃতি তিরোভূত হইয়া থাকে বলিয়াই যখন ঘটত্ব আবির্ভূত সেই সময় পটের আচ্ছাদন-প্রভৃতি কার্য্য ঘটের দ্বারা করিতে পারা যায় না। এক সময়ে একটি ধর্ম্মই আবির্ভূত, ও অপর ধর্ম্মগুলি তিরোভূত থাকে। ইহার কারণ কি? ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন কিছু নহে। আমি বহু হইব—"বহু স্যাম্," তাঁহার এই উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে। আমরা বলিয়া থাকি—এখানে ঘট নাই। ঘট সেখানে দেখাও যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তৃণাদি কোন-না-কোন বস্তু সেখানে থাকেই। যাহা থাকে, ধরা যাউক তৃণ আছে, তাহাতে—সেই তৃণে যেমন তাহার ধর্ম্ম তৃণত্ব আছে, সেইরূপ তিরোভূত ঘটত্বও আছে, ঘটও সেখানে তিরোভূতভাবে রহিয়াছে। অতএব 'এখানে ঘট নাই' ইহা কেবল ব্যবহারমাত্র, বস্তুতস্ব তাহা নহে। কোন আবরণের মধ্যে দীপ আবৃত থাকিলে তিরোহিত থাকিলে সেখানে দীপ নাই ইহা বস্তুত বলা যায় না।

এই নিয়ম-অনুসারেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত জড়জগৎও বস্তুত সৎ-, চিৎ- ও আনন্দ-স্বরূপ; ঘট-পট সবই সৎ-, চিৎ- ও আনন্দ-স্বরূপ। কিন্তু তাহাতে চিৎ ও আনন্দ তিরোভূত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদের নিকটে ইহারাও আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য জীবও সচ্চিদানন্দ, কিন্তু তাহাতে আনন্দ তিরোভূত হইয়া রহে, এবং যথাসময়ে আবির্ভূত হয়।

সর্প যেরূপ নিজের ইচ্ছায় নিজের আনন্দে কুণ্ডল করিয়া অবস্থান করে ব্রহ্মও সেইরূপ নিজের ইচ্ছায় নিজের আনন্দে রমণের জন্য এই সমগ্র বিশ্ব-রূপে প্রকাশিত হন। শ্রুতিতে (বৃহ·১·৪·৩) এই কথাই উক্ত হইয়াছে—একাকী আনন্দ হয় না, তাই তিনি নিজের দ্বিতীয় (কিছু) ইচ্ছা করিয়াছিলেন—"একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

এইরূপে সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বময় এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মৃত্তিকাদি বা তৎকার্য্য ঘটাদি সমস্তই সেই ব্রহ্মের রূপ; এই সমস্তরূপে তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন।* তাহা ভিন্ন কিছুই নাই, দ্বৈত অর্থাৎ ভেদের লেশও নাই, এক অদ্বিতীয় অদ্বৈত তিনিই বিরাজ করিতেছেন। এইজন্য এই মতকে শু দ্ধ ব্র হ্ম বা দ বলা হইয়া থাকে।†

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে জগতের কারণ ও জগৎকে তাহার কার্য্য বলেন বটে, কিন্তু তাহা পরমার্থত নহে। তাঁহার মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুত কোন সত্তা নাই; ইহা মায়িক—মায়াপরিকল্পিত, মিথ্যা, নশ্বর। ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বও এইরূপ মায়িক, ভ্রান্তিমাত্র। অতএব জগৎ ও ব্রহ্মের এই যে কার্য্যকারণভাব তাহা পারমার্থিক নহে, তাহা কেবল মায়ার সম্বন্ধে কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুত নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। ইহাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। এ স্থানে স্পষ্টই দেখা গেল যে, শঙ্কর যে অদ্বৈত স্থাপন করিতেছেন তাহার মূলে মায়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। জড়জীবময় জগৎ মিথ্যা হওয়ায়, তাহার সহিত ব্রহ্মের অ দ্বৈ ত বা অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। রজ্জু-সর্পস্থলে সর্প যেমন মায়িক মিথ্যা, তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, রজ্জুর সত্তাতেই তাহার সত্তা, রজ্জু ভিন্ন তাহা কিছু নহে, রজ্জুর সহিত তাহার অভেদ বা অ দ্বৈ ত, শঙ্করের মতে জগৎ- ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আলোচ্য মত কিন্তু সেরূপ নহে। এই মতে জগদ্-ব্রহ্মরূপ কার্য্যকারণে কোন মায়াসম্বন্ধ নাই। ব্রহ্ম যেমন পা র মা র্থি ক জগৎও সেইরূপ পা র মা র্থি ক। ইহারা উভয়ই শু দ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত। ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে, কেননা কারণ ব্রহ্মই কার্য্য জগদ্রূপে প্রকাশিত হইতেছে; ইহাদের পরস্পর অ দ্বৈ ত অর্থাৎ অভেদ। এই জন্যই আলোচ্য মতকে শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ বলা হইয়া থাকে।‡

* নৃসিংহোত্তর. ৯।

* "মৃদাদি ভগবদ্রূপং ঘটাদ্যাকারাসংযুতম্।
মূলেচ্ছাতস্তথা তস্মিন্ প্রাদুর্ভাবো হরেস্তদা॥"—নিবন্ধ।

† "অতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বরূপত্বাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ক্রিয়মানত্বাচ্চ সর্ব্বদা ব্রহ্মত্বমিতি শু দ্ধো ব্র হ্ম বা দঃ"—প্রমেয়রত্নার্ণব, প্রপঞ্চবিবেক।

‡ দ্রষ্টব্য :—
"অত্রৈব শঙ্করাঃ প্রাহুর্মায়িকং নশ্বরং জগৎ।
মায়াসম্বন্ধতো ব্রহ্ম কারণং নান্যথৈব হি॥

* * *

কার্য্যকারণের অবস্থাসম্বন্ধে শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—মৃত্তিকা, ঘট ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম বা ভগবানের রূপ। এই সমস্ত বিবিধ রূপের মধ্যে যাহাতে আবার কোন রূপের আবির্ভাব হয় তাহা কারণ, এবং যে রূপের আবির্ভাব হয় তাহা কার্য্য। মৃত্তিকা ভগবানের একটি রূপ, এবং ঘটও তাঁহার আর একটি রূপ। মৃত্তিকায় ঘটের আবির্ভাব হয়, অতএব মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট কার্য্য।

সবই যখন ব্রহ্ম হইল—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", এবং ভগবান্‌ও স্বয়ং তাহা বলিতেছেন—"মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা দৃষ্টি দ্বারা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আমিই গৃহীত হইয়া থাকি, আমা হইতে অন্য কিছু নহে",* তবে এই পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না কেন?

যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা ত উপলব্ধি করিয়াই থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ নহেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং তাহার কারণ আছে। অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে এইরূপ হইয়া থাকে। মায়া জীবকে বিমুগ্ধ করিয়াই নিবৃত্ত থাকে না। সংসারে ঘট-পট-প্রভৃতি যে সকল সত্য পদার্থ আছে, মায়া স্ববিমোহিত জীবের বুদ্ধিতে তৎসদৃশ একরূপ মায়িক পদার্থ উৎপাদন করে, এবং সেই উৎপাদিত মায়িক পদার্থকে পুরঃস্থিত বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত করে। এইরূপে জীব যখন কোন পদার্থকে দর্শন করে, তখন সেই পদার্থের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত মায়িক পদার্থকেও দর্শন করে, সত্য ও মায়িক উভয় পদার্থই তাহার ঐ এক জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই ঐ জ্ঞান ভ্রমরূপ। ভ্রমজ্ঞান কোন বস্তুর নিয়ামক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার সেই সর্পজ্ঞান রজ্জুকে বস্তুত সর্প করিয়া দিতে পারে না, রজ্জু সর্প হয় না। অতএব যদিও অব্রহ্মবিৎ জীব দৃশ্যমান সংসারপ্রপঞ্চকে সচ্চিদানন্দরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখিতেছে, তথাপি তাহার ঐ জ্ঞান বস্তুত সংসারপ্রপঞ্চকে অন্যরূপ করিতে পারে না। ব্যামোহিত বুদ্ধি পদার্থসমূহকে অন্যরূপ মনে করে, কিন্তু পদার্থসমূহ বস্তুত অন্যথা হয় না।

ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, তাহাকে বিষয় বলা হয়। ব্রহ্ম বা ভগবান্ ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন ইন্দ্রিয় ভগবানকেই গ্রহণ করে, আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকেই গ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব ভগবান্ বিষয়, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে এই বিষয়ের একটি বিশেষ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ইহা বি ষ য় তা নামে উক্ত হইয়া থাকে। * যদি কেহ প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার মনে হয় যে, তাহার পুরঃস্থিত ঘটও ঘুরিতেছে। এস্থলে সেই ব্যক্তির ঘটের আকৃতি-প্রভৃতি যথাভূত বি ষ য় ই প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু সেখানে যে সেই ঘটের ঘূর্ণন প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহা যথাভূত বিষয় নহে, মায়াজন্য বি ষ য় তা। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বিষয় এবং তাহা ভগবাত্মক; ঘটের স্বরূপ অর্থাৎ বস্তুভূত ঘট বিষয়, ভগবদাত্মক; কিন্তু সেই ঘটেরই উৎপত্তি, বিনাশ, কুৎসিতত্ব-প্রভৃতি বিষয়তা, এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণের ন্যায় মায়িক। অতএব বিষয়তাজনিত জ্ঞান ভ্রম, এবং বিষয়জন্য জ্ঞান প্রমা।

এই বিষয়তা দ্বিবিধ, আচ্ছাদিকা ও অন্যপ্রতীতি-হেতু। আচ্ছাদিকা অর্থাৎ যাহা বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহাকে প্রকাশ হইতে দেয় না। ইহার জন্যই বিষয়ের ব্রহ্মরূপতা প্রকাশিত হয় না। যাহা দ্বারা কোন বস্তু স্বরূপে প্রতীত না হইয়া অন্য রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা অন্য প্রতীতিহেতু। ইহাতেই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপে প্রতীয়মান না হইয়া অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

বল্লভদর্শনের এই আচ্ছাদিকা ও অন্যপ্রতীতিহেতু বিষয়তা শঙ্করদর্শনের মায়ার যথাক্রমে আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি ভিন্ন বস্তুত আর কিছুই নহে।

বিষয়তাকল্পনার সার তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থসমূহের অন্যপ্রকার প্র তী তি হয়, কিন্তু পদার্থসমূহ অ ন্য প্র কা র নহে, প্রতীতিতেই ভেদ, স্বরূপে ভেদ নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বারতা।

নয়নের ভাষা বুঝিবার আশা
প্রণয়ী কেবল রাখে
তাইতে ধরণী সারা নিশিদিন
আকাশে চাহিয়া থাকে!

এতন্মতে সুনিষ্পন্নং সাঙ্কর্য্যং কার্য্যকারণে
তন্নিবৃত্ত্যর্থমাচার্য্যৈঃ পদং শুদ্ধং বিশেষিতম্ ॥
শুদ্ধাদ্বৈতপদে জ্ঞেয়ঃ সমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ।
অদ্বৈতং শুদ্ধয়োঃ প্রাহুঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষং বুধাঃ ॥
মায়াসম্বন্ধ রহিতং শুদ্ধমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
কার্য্যকারণরূপং হি শুদ্ধং ব্রহ্ম ন মায়িকম্ ॥"
—শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড, ২২-২৮।

* "মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেইহন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যাদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥"—ভাগবত।

* বল্লভাচার্য্য বলিয়াছেন—"বিষয়তা মায়াজন্যা, বিষয়ো ভগবানিতি।"—সুবোধিনী।

অনাদি কালের অসীম বারতা
জানে সেই নত আঁখি,
নিশার কালিমা যেথা সোণা হয়
রবির কিরণ মাখি!

আঁধার যেথায় শুভ্র হয়ে যায়
চন্দ্রে পরশ করি
ইন্দ্রধনুকে মিলনের সেতু
শূন্যে ওঠে গো গড়ি!

নিকষ কৃষ্ণমেঘের ললাটে
অনলের লেখা আঁকি,
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে যে বারতা আসে
বুঝিতে থাকে না বাকী!

২০।৫।১২

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কর্ম্মসৃষ্টি।

আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মানুষ এবং আমাদের সেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই আমরা অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছি। আমাদের একজনের রুচি, সংস্কার, আচার-অভ্যাস, ভাললাগা-মন্দলাগা কত মানুষের সঙ্গেই মেলেনা দেখিতে পাই। সেইজন্য এই বিশাল জনসমাজে আমরা নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অনুরূপ এক একটি বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র গড়িতেছি। শুধু কর্ম্মক্ষেত্র নয়, এদেশে আমরা যাহার এক সমাজভুক্ত তাহারাও সামাজিক মেলা-মেশার ক্ষেত্রগুলিকে নানা ভাগে খণ্ডিত করিয়া লইতেছি। চক্‌কাটা সতরঞ্চের মত আমাদের কর্ম্মের ও সামাজিকতার বিভাগগুলি একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট।

যাকে বলে নির্ব্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা তাহা এই ব্যবস্থায় বেশ সহজ হয়। আমাদের আধুনিক সমাজটা যেন একটা মস্ত পায়রার বাসা, তার খোপগুলি ঘেঁষাঘেঁষি কিন্তু ভাঙিবার উপায় নাই। খোপের বাহিরে অবশ্য উদার আকাশের বিশাল সঞ্চরণক্ষেত্র, কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত উড়িবার মত পাখার বল নাই। সুতরাং যে যার আপন আপন খোপে বসিয়া নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সীমার অভ্যস্ত আরামই সীমার পীড়া, তাহার বেদনার কারণ। আমাদের সঞ্চরণক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র, আনন্দের ক্ষেত্র যে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে, আমরা যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতেছি—নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার জন্য এক একবার এক একজনকে সে কথাটা বাজে। সে বেশ বোঝে যে এই আরামই জীবনহীনতা, ইহাতেই যথার্থ অবসাদ এবং নিরানন্দ।

আমরা কেহ বা উকিল কেহ বা ডাক্তার। দিনরাত আমাদের সমস্ত চিন্তা বাদীপ্রতিবাদীর সাক্ষী জেরার মধ্যেই ঘুরিয়া মরিতেছে, বাসায় ফিরিয়া আসিয়াও সেই সব উত্তর প্রত্যুত্তর নথিনজির লইয়াই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকি। ডাক্তার হইলেও ঐ একই দশা। কেবলি রোগের কথা—যেন জগৎটা আগাগোড়াই হাসপাতাল। মাথা একেবারে অপরাধ এবং রোগ এবং অর্থোপায় এই চিন্তার একটি মৌচাকের মত হইয়াছে, দিনরাত ঐ কথাগুলিই মৌমাছির মত ভনভন্ করিয়া ফিরিতেছে।

এমনি করিয়া দেখি যে আমাদের যার যাহা ব্যবসায়, সে তাহার বাহিরে আর কিছুই ভাবে না। আদালতের বা হাসপাতালের বাহিরেও যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ পড়িয়া আছে এবং সেখানেও যে কত দিকে মানুষ আপনার চিত্তশক্তিকে কত বিচিত্ররূপে তরঙ্গিত হিল্লোলিত করিতেছে, সে কথাই মনে আসে না। হৃদয় যে সেই বিরাট মনুষ্যলোকের মধ্যে নাই এবং সম্বন্ধ যে সেই বহু বিচিত্র মনুষ্যের সঙ্গে স্থাপিত হইতেছে না, ইহার বেদনা কি কোথাও লাগে!

আমাদের দেশে অবশ্য এরূপ 'কুণো' হইবার কারণ আছে। প্রত্যেক দেশেই মনুষ্যত্বের সকল কর্ম্মজালকে এক সূত্রের মধ্যে গাঁথিয়া ভরিয়া রাখে রাষ্ট্রশক্তি বা সমাজশক্তি। এই কারণে ইংলণ্ডে কর্ম্মপ্রবাহ এ দেশের চেয়ে শতগুণে বিস্তৃততর এবং বেগবান হইলেও সেখানে সমস্ত কর্ম্মের একটা সম্মিলিত রস রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়া এবং সামাজিক নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়া সকলের পক্ষেই উপভোগক্ষম হইয়া উঠে। সমস্ত দেশময় যে বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই চেতনাটাই সে দেশের লোকের কর্ম্মোৎসাহকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। কিন্তু আমাদের দেশে কর্ম্ম মানে যে চাকুরী—সুতরাং আমাদের কর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া সকল কর্ম্মের একটি মহীয়সী মহতী মূর্ত্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার উপায় কি?

উপায় সহজ—যদি দেশের লোকে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু সৃষ্টি করে। কিন্তু কোথায় করে? আর করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা টেঁকে কৈ? তবে কি শক্তির অভাববশতই আমরা স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মসৃষ্টি করিতে পারি না?

আমার মনে হয় শক্তির অভাব এ বিষয়ে যতটা নাই তদপেক্ষা অনেক বেশি আছে যথার্থ প্রেরণার অভাব। সৃষ্টিমাত্রেই প্রেরণার অপেক্ষা রাখে। কোন কবি

বলিয়াছেন যে ভগবান যে সৃষ্টি করেন তাহার প্রেরণা আমাদের মধ্য হইতে তিনি পান—তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমই সেই প্রেরণা। একলা তো কিছুই সৃষ্টি হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা বিশ্বপ্রকৃতির সারভূত নারীর সৌন্দর্য্য ও কল্যাণভাব যখন কবিচিত্তকে আঘাত করে, তখনই তো কাব্য সৃষ্টি হয়। আমরা সেই কর্ম্মসৃজনের বড় প্রেরণাটা পাইতেছি না। তাই ভূতের খাটুনি খাটিয়া যাইতেছি।

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। ইংলণ্ডে এমন নর্সিংহোম বা রোগীর শুশ্রূষাগার আছে যাহা গর্ভমেণ্টের সাহায্য-চালিত নয়, পয়সা দিয়া থাকিলে যেখানে যে কোন রোগী খুব সুচিকিৎসা এবং শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। আমাকে কোন বড় ডাক্তার একবার বলিতেছিলেন যে এদেশীয় সাধারণ হাসপাতালে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সেবক ও সেবিকারা যত্ন করিয়া রোগীকে দেখে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে কয়েকজন সুযোগ্য চিকিৎসক মিলিয়া যে এরূপ একটি জনহিতকর অথচ লাভজনক অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিবেন, সে উৎসাহ কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। নিজের হাত পা মাথাকে খাটাইবার এবং নিজের কর্ম্মশক্তিকে অন্য সকলের কর্ম্ম-শক্তির সঙ্গে যুক্ত করিয়া বড় করিয়া দেখিবার প্রেরণাটাই নাই। পায়রার খোপটাই অত্যন্ত প্রিয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া কোন নূতন স্থানে যাইবার একটা অহেতুক ছট্-ফটানি বা ব্যাকুলতা দেখা যায় না।

আসল কথা কর্ম্ম যে সৃষ্টি, এই তত্ত্বটি আমাদের বোধের মধ্যে ধরা দেয় নাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্ম স্বয়ং "নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং" এবং বিশ্বকর্ম্মা। কবির কাব্যও তাঁহার সৃষ্টি; শিল্পীর শিল্পও তাঁহার সৃষ্টি; ঠিক্ তেমিতর কর্ম্মীর কর্ম্মও সৃষ্টি। কিন্তু সে কথা আমরা ঠিক্ জানি না এবং সেই সৃষ্টির কোন ভিতরকার প্রেরণাও পাই না।

অথচ আমরা সবাই সবাইকে বলি—কাজ কর, কাজ কর। কারণ, কতই করিবার আছে। কিন্তু এ কথায় আমার মনে পড়ে—রবি বাবুর খেয়ার মধ্যে 'অনাবশ্যক' নামক একটা কবিতা। যার ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই, এমন একজন লোক অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত দীনভাবে যাপন করিতেছে। সে একদিন 'আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে' একজনকে যাইতে দেখিয়া কহিল,—আমার ঘরে দীপ নাই, ওগো এইখানে তোমার দেউটি রাখিয়া যাও! কিন্তু সে প্রদীপ সেই বালিকা নদীতে ভাসাইয়া দিল, অগণ্য তারাভরা আকাশে আকাশপ্রদীপ করিয়া তুলিয়া দিল, দীপালিতে সাজা-ইয়া দিল। অকারণে! কারণ তাহাতেই যে আনন্দ! যেখানে সহস্র দীপ জ্বলিয়াছে, সেইখানে নিজের দীপটি সঁপিয়া দিতেই তো আনন্দ! অভাবের দিক্ স্মরণ করিয়া তো জীবনের চরমোৎসর্গ হয়না, ভাবের আনন্দেই উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়। আমরা যদি বড় কাজের বড় আনন্দ যে কি তাহা না জানি, তবে শুধু শুধু অগণ্য অভাব দেখাইলেই কি আঁধার ঘরে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রদীপটি আপনি জ্বলিয়া উঠিবে—দান আপনি ছুটিয়া আসিবে? আইডিয়াতেই লোকে প্রাণ দেয়, অভাব অত্যন্ত গৌণ জিনিস, সে কিসের জোরে প্রাণকে উৎসর্গ করিতে ডাকিবে?

আমাদের এই বৃহৎ সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে সকল সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতাই সকলের চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। সেই জন্য সে সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে বড় সৃজনের আনন্দ জাগে না। আশ্চর্য্য এই, যে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় একথা ভুলিয়া যায় যে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ততক্ষণ পর্য্যন্তই আছে, যতক্ষণ সমস্ত সমাজের সঙ্গে তাহার ভাবের বা আদর্শের যোগ হইতেছে না। তাহার বিচ্ছিন্নতাতে তাহার কোন সার্থকতা নাই—বরং ক্রমাগত সমস্ত বিপুল জনসমাজের মধ্যে প্রাণপণে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টাতেই তাহার সার্থকতা। তাহার উদ্দেশ্য তো খোপ রচনা নয়—তাহার উদ্দেশ্য সমাজকেই বড় করা। কিন্তু কি পরিতাপ, যে সমস্ত সমাজের সঙ্গে আর এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় সকলের অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ প্রায় দেখাই যায় না। এই ভুল ধারণা যে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে, যে স্বাতন্ত্র্যই গৌরব।

কর্ম্মসৃষ্টির আনন্দ যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানে কর্ম্ম সমস্ত মানুষকে দলাদলি বিস্মৃত করাইয়া কেমন আশ্চর্য্য বাঁধনে বাঁধে! কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কয়লার খনির মজুরেরা যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনে মজুরদের একটা বড় সভা হইয়াছিল। উর্দ্ধতন বেতনের হার কত হওয়া উচিত এবং যাহারা লোক খাটায় তাহাদের কাছে কি দাবী মজুরগণ জানাইবে, এই আলোচনার জন্য সকল স্থানের শ্রমজীবীরা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। কি চমৎকার! ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কি দীপ্ত তেজ, পরস্পরের কর্ম্মের মধ্যে কি ঐক্যবন্ধন, এবং সহানুভূতির যোগ!

এমনি করিয়াই কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের মিলনে ও প্রতিযোগিতায় বিষ ও অমৃত দুইই মথিত হইয়া উঠে। এই মন্থনেই তো আনন্দ। মানুষের মধ্যে দেবাসুর দুই পক্ষই আছে এবং লড়াইও আছে। দেবপক্ষই জয়ী

হইয়া উঠিতেছে এবং উঠিবে। এবং যিনি নীলকণ্ঠ তিনি বিষকেও আপনিই ধারণ করিতেছেন, সে বিষ মনুষ্যসমাজকে বিক্ষত করিতেছে না। এই জন্যই তো তিনি শিব—কর্ম্মসৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার শিবত্ব যদি পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিত, সকল অমঙ্গল যদি দূর হইয়া না যাইত, তবে কর্ম্মের দাহ কি প্রচণ্ড কি ভীষণই হইত!

আমরা অনেকেই জীবনসংগ্রামে পড়িয়া দশটা হইতে পাঁচটা এবং হয়ত সমস্ত দিনই ভূতের মত খাটিয়া মরিতেছি, কিন্তু এ খাটুনিতে অমৃতও নাই বিষও নাই। উদ্যমও নাই ব্যাঘাতও নাই। এ একটানা—একঘেয়ে কাজ—ইহাতে আমাদের আনন্দ জাগে না। সৃষ্টির দিক্ হইতে কর্ম্ম না করিলে তাহা পরম নিরানন্দের হেতু হয়—তখনই কর্ম্ম শৃঙ্খল, কর্ম্ম দাসত্ব, কর্ম্ম বন্ধন।

আমাদের সাহিত্যের দিকেও যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন তাহার মধ্যে 'Song of the open road' মুক্ত পথের গান কোথাও পাই না।

ছোট ছোট কৃত্রিম গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া সকল মানবের মহাযাত্রার পথে আহ্বান করিবার জন্য কবি হুইটম্যান ঐ কাব্যটি লিখিয়াছেন। সে সুর আমাদের মধ্যে কোথায়? উপন্যাস পড়ি, সেখানে সমস্ত ঘটনাগুলিই অত্যন্ত 'ঘোরো'—তাহার চারিদিকে মনুষ্য ইতিহাসের বড় বড় শক্তির কোন প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত লাগে না। কেবল প্রণয় কলহ, বিচ্ছেদ, মান অভিমান ভিন্ন এ দেশের মানুষ কি আর কিছুই জানে না? সে শুধু আপিসে যায় নয় বিষয়সম্পত্তি দেখে, এবং অন্দরমহলেই যা কিছু নড়াচড়া করে? তাহারও মধ্যে কোন সাহসিক প্রবলতা নাই—অত্যন্ত মৃদুল, ললিত, সৌখীন, ক্ষীণপ্রাণ নড়াচড়া।

এই জন্যই বোধ হয় 'গোরা' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এই প্রথম আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেশের মধ্যে মানুষকে দেখিলাম। দেখিলাম কেবল কতগুলি নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল, মহেন্দ্র, রমেশ নয়—কিন্তু একটা যথার্থ মানুষের মত মানুষ, বীর মানুষ। যার শক্তি বড়, কল্পনা বড়, জীবনের ক্ষেত্র বড়, এবং প্রবৃত্তিও বড়। যে আপনার পায়ের উপর আপনি শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে জানে। এবং সর্ব্বোপরি যাহার প্রবল ইচ্ছা সৃজন করিবার আনন্দে ভরপুর।

সেই মনুষ্যত্বের অজেয় অপরিমেয় মহান্ শক্তির আবির্ভাব নহিলে আমাদের কিছুই প্রাণ পাইবে না। কর্ম্ম হইবে নিরানন্দময় এবং সাহিত্য হইবে সৌখীন্। এই কারণে আমার মনে হয় যে আমাদের সাহিত্যে আমরা কেবলি গীতি কবিতা পাইয়াছি কিন্তু নাট্য পাই নাই।

গানে যে বেদনা বাজে। সে কেবল আপনার বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকেই কখনো 'এবার ফিরাও মোরে' বা 'বর্ষশেষে'র মত রুদ্র ক্রন্দনে কিম্বা কখনো নানা ফুল পাতায় সজ্জিত করিয়া নানা আবরণে ঢাকিয়া লুকাইয়া কত ছলে কত লীলায় প্রকাশ করে। "বাহিরে তার হাসির ছটা, ভিতরে তার আঁখির জল!" কিন্তু নাটকে যে বিরুদ্ধ নানা শক্তির প্রবল সংঘাত চাই। গান যেন আষাঢ়ের মন্থর মেঘ; তাহার অন্তর বেদনার বিদ্যুতে ক্ষতবিক্ষত, তাহার চক্ষে কোন্ দূরের স্বপ্ন,—সে অশ্রুসজল, কোমল, স্নিগ্ধ, রমণীয়! নাটক ঝড়ের মত—সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির ভীষণ সংঘর্ষ—মেঘে বায়ুতে বৃক্ষলতায় তুমুল মাতামাতি ব্যাপার। তাহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে একটি অচলা শান্তি সমস্ত প্রলয়ের উর্দ্ধে জাগিয়া থাকে বটে;—কিন্তু তাহার বাহ্যরূপ সুদুঃসহ এবং ভয়ঙ্কর।

নানা শক্তির সংঘাত বিচিত্র কর্ম্মসৃষ্টির মধ্য দিয়াই হয়। যে সমাজে সে সংঘাত নাই, সেখানে নাটকও হয় না। তাই দেখিতে পাই আমাদের সকল নাটকগুলিই ইংরাজীতে যাহাকে বলে melodrama তাহাই। ঐ মেলো, বা বিগলিত অংশটুকুই আমাদের নাটকের সারসর্ব্বস্ব। দেখনা কেন, আমাদের নাট্যকারগণ নাট্যের বিষয় খোঁজেন ইতিহাস নয়, কিন্তু আরব্যোপন্যাসে। আর ইতিহাস হইতে যেখানে ঘটনা সংগ্রহ করেন, সেখানে এমন ঘটনা বাছেন যাহা ইতিহাসের ভাঙাগড়ায় লীলার মধ্যে স্থান পায় না। যাহা উপন্যাসজাতীয়, বাস্তব এবং সজীব বস্তু নয়।

কর্ম্মসৃষ্টির বৃহৎ আনন্দের অভাবে আমাদের সকল সাধনাই পঙ্গু।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

অর্ঘ্য।

সপ্ত সাগর এসেছে সাজিয়া
কল্লোল গান তুলি,
নদীতরঙ্গ কি মহা পূজায়
আসিয়াছে ছুলি ছুলি!
আকাশ-পদ্মে অলিসম ধায়
গ্রহ তারা শত শত,
মধুপানে ভোর অশ্রুত সুরে
গুঞ্জরে অবিরত।

ডালায় ডালায় ভারে ভারে আজি
অর্ঘ্য বহিয়া সবে
ভুবনে ভুবনে গগনে গগনে
গাহিছে জয়োৎসবে।
গাহি উঠে তারা "হে পরম প্রাণ
তোমারি ধারায় ভাসি,
মহাকালস্রোতে ভ্রষ্ট কুসুম
সুন্দর রাশি রাশি!
ফুটে উঠি শুধু নিমেষের তরে
তোমারি পূজার লাগি;
তব মন্দিরে ধূপসৌরভে
আরতির বেলা জাগি।
নিমেষের ভর না সহিতে কোথা
ভেসে যাই নাহি জানি—
তোমারি লাগিয়া যা ফুটেছে তাই
তোমারি চরণে আনি!
তোমারি কাননে হসিত আননে
নন্দনরাগ ফুটে!
মধুরসধারে দিবসে নিশীথে
পিপাসিত প্রাণ লুটে!
আকাশের কালো জলদ, মন্দ্রে
তোমারি গভীর ধ্বনি
বিজলীর নাচে শুনি বাজে তব
নৃত্যের নিক্বনি!
সকল প্রভায় সকল শোভায়
তোমারি আভাস লভি,
আনন্দে মাতি গাহে দিবারাতি
মুগ্ধহৃদয় কবি!
ওগো মহাপ্রাণ, সকলি তোমার
পূজার অর্ঘ্যভার—
সব চরাচর সরিৎ সাগর
বন্দনা-ফুলহার।"
এই সুরে উঠে মহাস্তবগান
অনাদি এ মন্দিরে—
ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে
এই গান দিয়ে ঘিরে!
সেই সবাকার পূজার সঙ্গে
মিলিবার লাগি মোর
হৃদয় ব্যাকুলি যায় দ্বার খুলি
টুটি বন্ধন-ডোর!

শ্রীকালিদাস বসু।

আজীবক।*

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মগ্রন্থে "আজীবক" নামক এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধ জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়ে এই সম্প্রদায়টি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোনো কোনো জৈনধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ গোশালা মস্খলিপুত্ত নামক একব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে গোশালা আজীবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত হন নাই বটে, কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের অন্যতম নায়ক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব ছয়টি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, গোশালা উহাদের একটিরই নেতা ছিলেন।

"আজীবক" কথার অর্থ লইয়া বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের অনুমোদিত অষ্টপথের একটির নাম "সম্যগাজীব"। সংস্কৃত "আজীব" শব্দের অর্থ ব্যবসায় বা জীবিকা উপার্জ্জনের প্রণালী। নিজ নিজ বর্ণের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া সাধুভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করাকেই সম্যগাজীব বলা হইত। কর্ম্মবন্ধনহীন সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গোশালার ধারণা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত রকমের ছিল। সম্ভবতঃ এই বিশেষত্বের জন্য তিনি এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ "আজীবক" নামে অভিহিত হইতেন। এই উপাধিটি সম্মানসূচক মনেকরিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গোশালাকে অনেকে মিথ্যাচার ভণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিত; তিনি ও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবনধারণের জন্য যে ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও মোক্ষলাভের বিরোধী বলিয়া নিন্দিত হইত। এইজন্য লোকে ইহাদিগকে ব্যবসাদার সন্ন্যাসী বোধে "আজীবক" বলিয়া উপহাস করিত। এই বিদ্রূপাত্মক নামটি কালক্রমে সম্প্রদায়ের নাম হইয়া উঠিল—এই নামটির মধ্যে গোড়ায় যে পরিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল উত্তরকালে তাহা দূরীভূত হইয়াছিল।

গোশালার জীবনের আখ্যানটা এইরূপ—গোশালার পিতা ভিক্ষাজীবী ছিলেন। তিনি মস্খলি বা দণ্ডধারী ভিক্ষুক ছিলেন বলিয়া গোশালা মস্খলিপুত্ত নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার "গোশালা" আখ্যালাভের কারণ এই যে, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভিক্ষাজীবী ও অনিকেতন জনকজননী দারুণ বৃষ্টিহেতু অনন্যোপায় হইয়া একখানি গোশালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড় হইয়া গোশালা পৈত্রিক ভিক্ষা

* Encyclopædia of Religion and Ethics হইতে সঙ্কলিত।

বৃত্তিই নিজের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে জৈনধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের সহিত তাঁহার দেখা হইত। মহাবীর এই সময়েই নিগ্রন্থ সন্ন্যাসীরূপে দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি দেশবাসীর গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা দর্শনে গোশালা এই সন্ন্যাসীর আনুগত্য স্বীকার করেন। মহাবীর প্রথমতঃ ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণকরিতে অস্বীকার করেন; বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন গোশালা শিষ্যত্ব লাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি শিষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই উভয় ব্যক্তির স্বভাবে ও প্রকৃতিতে এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল যে, দীর্ঘকাল ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব রহিল না। ছয় বৎসর পরে গোশালা তাঁহার কপটাচার ও ছলচাতুরীর জন্য গুরুগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। এই সময়ে তিনি "আজীবক" নামক প্রতিদ্বন্দী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রাবস্তি নগরের এক কুম্ভকার নারীর গৃহ তাঁহার প্রধান বাসভবন হইল। মহাবীর ষোলবৎসর কাল গোশালার কোনো সংবাদই রাখিতেন না; অতঃপর তিনি শ্রাবস্তিনগরে গমন করিয়া তথায় কপটাচার গোশালার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এই ভণ্ডের চরিত্রহীনতার কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মহাবীর তাঁহার নিন্দাবাদ রটনা করিতেছেন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র গোশালা নিগ্রন্থসাধুর বাসভবনে সশিষ্য গমন করিলেন। তিনি মহাবীরকে নানাপ্রকারে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সহিত তুমুল বাক্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইলেন যে, তিনি কোনো কালে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন না; যে গোশালা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি হইবেন। কুতর্কী গোশালার বাক্‌চাতুরী ব্যর্থ হইল, তিনি সাধারণের চক্ষে একান্ত অপদস্থ হইয়া গেলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি মহাবীরকে অশিষ্ট ও অভদ্র ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহাবীরের শিষ্যদের সহিত গোশালার অনুচরদের হাতাহাতি আরম্ভ হইল। লড়াইয়ে মহাবীরের শিষ্যেরাই হটিয়া গেল; কিন্তু গোশালা স্বয়ং মহাবীরের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাভূত হইয়া বিষণ্ণমনে পলায়ন করিলেন। বিপক্ষীয়দের বিদ্রূপবাক্যে ও নগরবাসীদের অবজ্ঞায় তাঁহার মন ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, অবশেষে তাঁহার মন এতদূর বিকৃত হইয়া গেল যে তিনি সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত পরিত্যাগ করিয়া নৃত্যগীতে মদ্যপানে ও কুম্ভকার রমণীর সহিত বীভৎস আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনের এই বিকৃত অবস্থা ছয়মাস কাল স্থায়ী হইল। অতঃপর তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি গভীর অনুতপ্ত হইলেন। অন্তিমকালে তিনি তাঁহার শিষ্যদের নিকটে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দী মহাবীরের অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। শিষ্যদিগকে তিনি এই অনুরোধ করিলেন যে, মৃত্যুর পরে যেন তাঁহাকে একান্ত অবজ্ঞার সহিত সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার কলঙ্কিত জীবনের প্রকৃত আখ্যান যেন সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। বলা বাহুল্য, শিষ্যেরা গুরুর এই আদেশ পালন করেন নাই।

গোশালা কিংবা তাঁহার কোনো অনুচর তাহাদের সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি বা নিয়ম কানুন সম্বন্ধে কোনো লিখিত বিবরণ রাখিয়া যান নাই। প্রতিদ্বন্দী জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থানে স্থানে ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ের বিবরণ মিলাইয়া ইহাদের সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাইতে পারে।

ভগবান বুদ্ধদেব নিন্দিত সন্ন্যাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীর জীবন যাপন প্রণালীকে তিনি "অব্রহ্মচর্য্যবাস" আখ্যা দিয়াছেন। অপর সন্ন্যাসীদিগকে তিনি "অনস্সাসিক" (unsatisfying) বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব মহাবীরকে দ্বিতীয়প্রকারের ও গোশালাকে প্রথম প্রকারের নিন্দিত সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে। বুদ্ধদেব আজীবকদের আচার ব্যবহার নীতি-বিরোধী বলিয়া নিন্দা করিলেন। তিনি গোশালাকে "মোঘ পুরিস" অর্থাৎ "ব্যর্থ-জীবন ব্যক্তি" বলিয়াছেন। তিনি তাহাকে ধীবরের সহিত তুলনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধীবর যেমন মৎস্যবিনাশের জন্য জাল পাতিয়া থাকে গোশালা তেমনি মানববিনাশের জন্য ফাঁদ পাতিয়াছেন।

বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই গোশালার ধর্ম্মমত এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—"জীবের বিকৃতির কোনো দূর অথবা আসন্ন কারণ নাই। তাহার উন্নতিরও কোনো কারণ নাই। আত্মশক্তি দ্বারা জীব উন্নত বা অবনত হইতে পারে না। উচ্চ নীচ জীব বা উদ্ভিদদের নিজস্ব কোনো শক্তি, বল বা ক্ষমতা নাই। তাহাদের বৈচিত্র্য কেবল মাত্র অদৃষ্ট, পরিবেষ্টন ও নিজ নিজ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।"

আজীবকেরা মানুষের "স্বাধীন ইচ্ছা" ও "নৈতিক-দায়িত্ব" একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। গোশালা তাঁহার এই অদ্ভুত ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মহাবীর গোশালার সম্বন্ধে আর একটি ভীষণ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, গোশালা তাঁহার অনুচরদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন যে, সন্ন্যাসীদের কোনো রমণীর সহিত অবৈধ মিলন ঘটিলে কোনো পাপ হয় না। বোধ হয় কুম্ভকার নারীর সহিত গোশালার অবৈধ সংযোগই এই অভিযোগের মূলীভূত কারণ।

মজ্‌ঝিম (মধ্যম নিকায়) গ্রন্থে সচ্চক (সত্যক) নামক এক নিগ্রন্থ সাধু ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট গোশালার অনুচরদের বাহ্যাচারের নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন—

ইহারা কোনো বস্ত্র পরিধান করে না। ইহারা সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া মনে করে এবং ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা আহার কালে হস্তাবলেহন করিয়া থাকে। ইহারা আহার-কালে আহ্বন-ঘণ্টা মানিয়া চলে না অথবা নিয়মিত সময়ে আহার করিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। ইহারা কোনো প্রকার আহার্য্যের জন্য আদেশ করে না কিংবা পাকস্থালী হইতে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। যে নারী গর্ভিণী অথবা যে নারী সন্তানকে দুগ্ধ দান করিতেছে তাহার হস্তের আহার্য্য ইহারা ভোজন করে না। মৎস্য, মাংস, ধান্য বা পুষ্প মদ্য গ্রহণ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কেহ একগৃহ হইতে একমুষ্টি, কেহ দুই গৃহ হইতে দুই মুষ্টি, কেহ বা সপ্ত গৃহ হইতে সপ্ত মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া থাকে।

জৈনধর্ম্মশাস্ত্র গোশালাকে মহাবীরের একজন শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। গোশালার কতকগুলি আচার মহাবীরের ধর্ম্মমতবিরোধী ছিল। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ "ভগবতী সূত্রে" উক্ত হইয়াছে যে গোশালা তাহাদের "অষ্ট মহানিমিত্ত" গ্রন্থ হইতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন।

গোশালাকে মঙ্খলি (মস্করিন্) অর্থাৎ একদণ্ডী বলা হয়। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে তিনি প্রথমে দণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এবং ইহাও সত্য যে, তিনি যখন মহাবীরের শিষ্য দলভুক্ত ছিলেন তখনও নিজের কতকগুলি বিশেষ মত পরিত্যাগ করেন নাই। ঐ সকল বিশেষত্বের জন্যই গোশালার অনুগত নিগ্রন্থ সাধুরা "আজীবক" আখ্যা পাইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার অনুচরেরা চিরদিনই দণ্ডধারণ করিয়াছেন। "দিগম্বর" বলিয়া তাহাদের মনে স্পর্দ্ধা ছিল। গোশালা মানুষকে ছয়টি অভিজাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা—কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত, শ্বেত এবং সুশ্বেত। শিকারী হত্যাকারী প্রভৃতি "কৃষ্ণজাতি," বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে "নীল-জাতি," কৌপীনধারী নিগ্রন্থদিগকে "লোহিতজাতি," অচেলক সাধুদিগকে পীতজাতি, আজীবকদিগকে "শ্বেত-জাতি" ও আজীবক সম্প্রদায়ের নায়কদিগকে তিনি "সুশ্বেত" জাতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অধুনা যাহারা "দিগম্বর" সম্প্রদায় নামে উক্ত হইয়া থাকে উলঙ্গ আজীবক দল হইতেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। বিনয়পিটকের একটি আখ্যান হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতে পারে। কথিত আছে, একদা বুদ্ধদেব কতিপয় ভিক্ষুসহ শ্রাবস্তিনগরে বাস করিতে-ছিলেন, তখন তথাকার এক ধনবতী রমণী তাঁহাদিগকে স্বগৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান করেন। আহার প্রস্তুত হইলে তিনি তাঁহার এক পরিচারিকাকে বুদ্ধদেবের বাসভবনে প্রেরণ করেন। পরিচারিকা সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, তথায় একদল সাধু সম্পূর্ণ নগ্নদেহে বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন; তিনি প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্রীকে জানাইলেন যে নির্দ্ধারিত স্থানে তিনি কোন বৌদ্ধ সাধু দেখিতে পাইলেন না, সেখানে গোশালার অনুচর উলঙ্গ আজীবকেরা রহিয়াছেন।

আজীবক ও দিগম্বর জৈনগণ যে অভিন্ন এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিবার হেতু নাই। ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জৈন লেখকগণ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। প্রসিদ্ধ টীকাকার সীলাঙ্ক এবং অভিধান রত্নাবলী প্রণেতা হলায়ুধও দিগম্বর এবং আজীবকদিগকে অভিন্ন বলিয়া লিখিয়াছেন। দিগম্বর, ত্রৈরাশিক, আজীব এবং আজীবক একার্থবোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

বর্ষানান্দী।

আকাশের তাপদগ্ধ ললাটের পরে
কে তুমি গো স্নেহময়ী বিছাইলে ছায়া,
ধরণীর তৃষাশুষ্ক পাণ্ডুর অধরে
ঢালিলে সলিল ধারা কেগো মহামায়া?

আকাশ-আশ্রিত মোরা, ধরার সন্তান—
তাপশীর্ণ, তৃষাতুর ব্যাকুল হৃদয়,
পরাণ ভরিয়া দাও সে স্নেহের দান,
সে স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া জীবন-আশ্রয়!

২৭।৫।১২

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যবোধ।*

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরও কয়েকটি জ্যোৎস্না-রাত্রির কথা মনে পড়চে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাক্‌ত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কত দিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই,—চাঁদের আলোর সঙ্গে বালুচরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে;—সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটি মাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জ্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্ম্মচারী। তিনি আমার পাশে চল্‌তে চল্‌তে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে সমস্তই দেনা-পাওনার কথা, জমিদারীর কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এতবড় নক্ষত্রলোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্ত্তে ভেঙে দিত, এবং এতবড় একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখ্‌তেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখ্‌তে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছিলুম—সেই জন্যে চারদিকের বড়কে আমি আর সত্য বলে জান্‌তে পারছিলুম না; এত বড় শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় আকাশভরা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারি সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারি বিষয়কর্ম্ম, আমারি আয়োজন প্রয়োজন—আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম, বস্তুত তখনি আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিলুম;—ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল—নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মত পরিহার করে চলে গিয়েছিল—এই দিগন্তব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না—আমি নির্ব্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব যে ভাবনা চারিদিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমি জমা হিসাব কিতাব মামলা মকদ্দমা, এ সমস্ত শূন্য-গর্ভ বুদ্‌বুদ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্চে।

তা হোক্‌, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে ঐ বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য, সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনি আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়র মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড় জগতে আমাদের বাস, বড় সত্যে আমাদের চির আশ্রয় এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে বড়তে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোট খাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে ত মানুষ থাক্‌তে দেয়নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আন্‌চে।

এই যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোট; আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি, জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড় তাঁকে প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখ্‌লে কারো হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কি দরকার!

কিন্তু মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এতবড় আকাশ, এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কি দরকার ছিল! আমাদের চারদিকে যথোপযুক্ত স্থানটুকু রেখে তার চারদিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হতনা—বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয় ত সুবিধা হত, অনেক কাজ হয় ত সহজ হতে পারত।

কিন্তু ছোটর পক্ষেও বড়র একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে একদিকে অত্যন্ত ছোট হলেও আর একদিকে অত্যন্ত বড়কে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হারায়নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চারদিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়র কথাই বলচে—আকাশ কেবলি বলুচে, বড়; আলোক কেবলি বলুচে,

* শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

বড়; বাতাস কেবলি বল্‌চে, বড়। দিবসের পৃথিবী তাকে বল্‌চে বড়; রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বল্‌চে, বড়। গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদীসমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করচে, বড়। ছোট মানুষটি বড়র মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়র মধ্যেই বিশ্বাস নিচ্চে, সে বড়র মধ্যেই সঞ্চরণ করচে।

এই জন্যে মানুষ ছোট হয়েও কিছুতেই ছোটতে সন্তুষ্ট হতে পারচেনা। এমন কি, ছোটর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে, বড়র মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়—তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের কাজের মধ্যে আপনাকে আরামে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে না। এই বড়র দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য—এই সহজ কথাটি কখন সে ভুল্‌তে থাকে? যখন সে আপন হাতের গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চারিদিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই নিখিল জগৎ থেকে যে বড়র মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠ্‌চে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোট হয়েও বড়, এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি এবং আমাদের সেই এক বড় দেবতার আসনটি ছোট ছোট শতসহস্র অপদেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়র মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস,—তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে,—যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলি বিষ জমে, তেমনি যখনি মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্রই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয় তখনি বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠ্‌তে থাকে; তখনি আপনাকে ভুল্‌তে পারিনে এবং অন্যকে কেবলি আঘাত করি।

যেমন আপনার সংসারের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে না দেখে জগতের মধ্যেই আপনার সংসারকে দেখলে তবে সত্য দেখা হয় এবং সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে নিজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সহজে ঘটতে পারে না তেমনি প্রত্যেক মানুষকেও আমাদের সত্য করে দেখা চাই।

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন্ দেখিনে? কখন্ তাকে ছোট করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখিনে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কি প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যবহারিক সম্বন্ধ কতখানি এই বিচারের দ্বারাই আমরা মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই—তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভাললাগা মন্দলাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে—আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখিনে।

জগৎকে অহরহ ছোট করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোট করে ফেলা হয় তেমনি মানুষকে কেবলি নিজের ব্যবহারিক সম্বন্ধে ছোট করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোট করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোট হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোট হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুক্‌রো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সামাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে একপয়সার চেয়েও ছোট করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করিনে—আমার লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ সমস্তেরই মূল কারণ হচ্চে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার দরুণ তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ—আমরা বড় হয়ে পরস্পরকে বড় করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে—তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড় হত

সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড় করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়—প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না করে' মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় বলেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু আমাদের তামসিকতাবশতঃ জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করিনে, মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারিনে। সেই জন্যে জগৎকে কেবলি আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেই জন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না থাকার মত হয়ে যায়—মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি; সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য যে দিকটা মহৎ সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না;—সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মত আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই আত্মীয়ের মত তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিইনে। এই জন্যে যদি চ আমরা বড়র মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়কে গ্রহণ করিনে—যদি চ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এই রকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি অপমান করি। মানুষকে এ রকম উপেক্ষা করে অবজ্ঞা করে আমাদের যে কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি হয় তা নয়—এমন কি অনেক সময় হয়ত প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে—কিন্তু এ একটা বিকৃতি। বৃহৎ সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সঙ্কীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে;—সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

এই আশ্রমে আমাদের যে সাধনা সে হচ্চে এই বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের সাধনা। সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই। এ সাধনা সহজ নয়—কিন্তু কঠিন হলেও তবু সত্যের সাধনাই করতে হবে। এ আশ্রম আমাদের সাধনার ক্ষেত্র—সে কথা ভুলে গিয়ে যখনি একে আমরা কেবলমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র বলে মনে করি তখনি আমাদের আত্মার বোধশক্তি বিকৃত হতে থাকে—তখনি আমাদের আমিটাই বলবান হয়ে ওঠে—তখনি আমরা পরস্পরকে আঘাত করি অবিচার করি—তখন আমাদের উক্তি অত্যুক্তি হয় আমাদের আচার অত্যাচার হয়ে পড়ে।

কর্ম্ম করতে করতে কর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে—কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম্মপ্রয়োজনের অতীতক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমনভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে—সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে—জগতে যিনি সকলের বড় তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি একথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা নানা প্রয়োজনে আঁটা আমির পর্দ্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনি চারদিকে দেখতে পাব জগৎ কি আশ্চর্য্য অপরূপ! মানুষ কি বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্চি; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয়নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে—এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎসৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব—এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতা-পাঠ।

পূর্ব্বপ্রপাটে যে শ্লোকটির অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী আটটি শ্লোকের সারাংশ একটি শ্লোকেই পর্য্যাপ্ত। সে শ্লোকটি এইঃ—

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এইঃ—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ধনঞ্জয়। কি ভাবে? না নিঃসঙ্গভাবে—নির্লিপ্তভাবে—অনাসক্তভাবে। আর কি ভাবে? না সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি সমদর্শিভাবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

এখানে চারিটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন—তাঁহাদের সেই যোগই তাঁহাদের নিকটে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এ যে সিদ্ধি—এ সিদ্ধির নাম পুরুষার্থসিদ্ধি। এ সিদ্ধির জন্য যিনি যত্ন করেন—গীতায় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি সহস্রের মধ্যে এক জন—"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে"। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার সিদ্ধি আছে যাহার নাম স্বার্থসিদ্ধি। সচরাচর লোকের নিকটে স্বার্থ-সিদ্ধিই সিদ্ধি—স্বার্থহানিই অসিদ্ধি; পরন্তু যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে (যেমন বলিলাম) যোগই পরম সিদ্ধি; তা বই, স্বার্থসিদ্ধি হয় হউক্, না হয় না হউক্, দুইই তাঁহার নিকটে সমান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রশ্ন-একটি উঠিতে পারে এই যে, তাহা যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে, যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে যোগই পরাকাষ্ঠা সিদ্ধি, তবে তো তিনি সিদ্ধ হইয়া চুকিয়াছেন—কর্ম্মানুষ্ঠানে কী তাঁহার প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই যে, যোগশাস্ত্রের তান্ত্রিক (technical) ভাষায় যাহাকে বলে "মৈত্রী" অর্থাৎ লোকের সহিত সমদুঃখসুখিতা, তাহা যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। যিনি আপনাকে জানেন যোগী মহাপুরুষ—অথচ যিনি হিতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাঁহার যোগ যোগই নহে। মহোদ্যমশালী সেনাপতি স্বয়ং যখন অশ্বপৃষ্ঠে অসিহস্তে বিরাজমান, তখন যে সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া বসিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে যেমন এ কথা খাটে না যে, সে—সেনাপতির সহিত যোগযুক্ত; তেমনি পরমেশ্বর স্বয়ং যখন সকল মঙ্গলের জাগ্রত জীবন্ত অধিনায়ক, তখন যে সাধক আপনার অধিকারায়ত্ত মঙ্গল-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-ব্রত ধারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না যে, তিনি পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন।—তবে কি তুমি বলো যে, কোনো সাধক যদি আর আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিভৃত স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হ'ন—তাঁহার পক্ষে তাহা অনুচিত কার্য্য?

উত্তর।—তাহা আমি বলি না। আমি বলি এই যে, পাঠাভ্যাসেরও সময় আছে, যোগাভ্যাসেরও সময় আছে। বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা চিরকালই কিছু-আর সদ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাস করেন না। এটা যেমন সত্য যে, তাঁহাদের পঠদ্দশায় তাঁহারা সব কাজ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাসে রত হ'ন; এটাও তেমনি সত্য যে, তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে কার্য্যে ফলাইয়া তোলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন-বাস সাধকের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন হয়, আর, প্রয়োজন হয় বলিয়াই তাহা শোভা পায়। পরন্তু, সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে তাহা শোভা পায় বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, তাহা সিদ্ধাবস্থার পরিচয়-লক্ষণ, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। যে বীজ মাত্রাতীত দীর্ঘকাল মাটি-চাপা থাকে সে বীজ মাটি হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, যে বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত, শাখায়িত, পল্লবিত, পুষ্পিত হইয়া, পরিশেষে ফলে পরিণত হয়, সেই বীজই শেরা বীজ। ব্যুৎপন্নচেতা সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই বিজ্ঞোচিত ধীর ভাব ধারণ করে, আর, সেই জন্য উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহারা ধীর নামে প্রসিদ্ধ; তেমনি, যোগে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই যোগযুক্ত মুক্তভাব ধারণ করে; আর, সেইজন্য তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত। এমন কি, গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—

"যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার আচার-ব্যবহার যোগযুক্ত, কর্ম্মচেষ্টা যোগযুক্ত, নিদ্রাজাগরণ যোগযুক্ত তাঁহার যোগই সর্ব্বদুঃখের মহৌষধ; অর্থাৎ সেইরূপ যোগই যোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

যেমন, বিদ্যাঙ্গ স্বতন্ত্র, আর, বিদ্যা স্বতন্ত্র; তেমনি, যোগাঙ্গ স্বতন্ত্র, আর, যোগ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে দশ-বিশ বৎসর ধরিয়া কেহবা মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণ, কেহবা ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রচুর পরিমাণে স্নানে উদরসাৎ এবং ধ্যানে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করি। চতুষ্পাঠীর গুরুগৃহ হইতে মহাদম্ভের সহিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। ইহাদের বিদ্যা ঐ পর্য্যন্তেই পরিসমাপ্ত। তেমনি যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, ময়ূরাসন প্রভৃতি তরো-বেতরো আসন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আসন-সিদ্ধ হ'ন, তাঁহারা যোগী যত হো'ন বা না হো'ন—রঙ্গ-প্রদর্শন-কার্য্যে বড় বড় ভেল্কিবাজদিগকে হারাইয়া দ্যা'ন। আবার যাঁহারা ঐরূপ কঠোর তপস্যার শ্যাম কেশ শুক্লে পরিণত করিয়া প্রাণায়াম-সিদ্ধ হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে কোনো মহাত্মা কৌতূহলাবিষ্ট দর্শকগণের বিস্মিত নেত্রের সমক্ষে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে ছয় মাস মাটি-চাপা

থাকিয়া শেষে যখন অস্থিচর্ম্মসার অর্দ্ধমৃত শরীরে অন্ধকার হইতে আলোকে বাহির হ'ন, তখন, তাহা-দৃষ্টে লোকের তাক্ লাগিয়া যায়—সকলেই বলে "ইনি সিদ্ধযোগী"। এরূপ সাধক যদি যোগী না হইয়া ডবুরী হইতেন তাহা হইলে সমুদ্রগর্ত্ত হইতে রাশি রাশি রত্ন সঙ্গ্রহ করিয়া মস্ত একজন ধনাঢ্য বড়লোক হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী যোগাঙ্গের অনুশীলন যোগপন্থী-দিগের পক্ষে অনিষ্টজনক বই শুভজনক নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। গীতাশাস্ত্র সাধককে শ্বাস রোধ করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বলিতেছেন না; বলিতেছেন তিনি—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে; অথবা যাহা একই কথা—পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার মঙ্গলকার্য্যে যোগ দিতে।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত যোগী পুরুষ যে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত, ভবগীতায় তাহা দুইটি শ্লোকে নির্ঘাত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে দুইটি শ্লোক এই :—

(১)

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি সোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

(২)

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

ইহার অর্থ এই :—

যে জন সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি—আপনাতেও যেমন, অন্যতেও তেমনি—সর্ব্বত্র সমান দেখেন, অর্জ্জুন, সেই যোগীই পরম যোগী। আবার যোগীদিগের মধ্যে তিনিই যুক্ততম যোগী যিনি আমা-গত প্রাণ হইয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন।

পরমাত্মার সহিত যোগে যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন যে, আপনারও যেমন—অন্যেরও তেমনি—সকল জীবেরই সুখ-দুঃখ একই অভিন্ন প্রেমানন্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। কেননা, গোড়ায় প্রেম না থাকিলে—বিচ্ছেদের দুঃখও থাকে না—মিলনের সুখও থাকে না—কিছুই থাকে না। যোগী পুরুষেরা সুখদুঃখমোহের আবরণ ভেদ করিয়া—আপনাতেও যেমন—অন্যতেও তেমনি—আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন; আর, সেইজন্য, সর্ব্বজগৎই তাঁহাদের নিকটে আনন্দময় এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহারা সদানন্দ। এইরূপে যাঁহার অন্তঃকরণে প্রেমানন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় তিনি আপনার আত্মাতে সর্ব্বজগতের আত্মা পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ভজনা করেন এবং তাহাতেই তিনি আপনার সমস্ত কামনার চরিতার্থতা লাভ করেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মসঙ্গীতের যথার্থ স্বরূপ।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্যসমাজ কর্ত্তৃক এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে যে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আইরিস কবি য়ীট্‌স্ সভাপতি হইয়া রবীন্দ্রনাথের তিনটি ধর্ম্মসঙ্গীতের অনুবাদ পাঠ করেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। কোন্ তিনটি কবিতার অনুবাদ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে তাহাদের একটিতে ঈশ্বরকে পথিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আর একটি মৃত্যুর উপরে, যেখানে মাতৃস্তন্য হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইবার উপমা আছে। মৃত্যু সেই এক স্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্তনান্তরে মানবশিশুকে পুনরায় আশ্বস্ত করিবার পূর্ব্বে ক্ষণকালীন বেদনা মাত্র—এ ভাবের কবিতা বোধ হয় নৈবেদ্যে আমরা পড়িয়াছি। সুতরাং এটি সম্ভবতঃ গান নয়। পথিকরূপে ঈশ্বরকে দেখা তো বহুস্থানেই আছে, যেমন;—

কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে!
হে একা, সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে!

য়ীট্‌স্, টমাস্ এ, কেম্পিসের "খৃষ্টের অনুকরণ" নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকের সহিত রবিবাবুর এই সকল গান ও কবিতার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "খৃষ্টের অনুকরণের" রচয়িতা যেমন পাপ-বোধের দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া সকল সৌন্দর্য্যকে ভক্তিসাধনার অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে ভাব আদবেই নাই। তিনি সকল সৌন্দর্য্যে, সকল ভোগের বস্তুতে ভগবানেরই প্রেমের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমই সৌন্দর্য্যরূপে কবির কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। আগষ্টমাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে এন্‌ড্রুস্ সাহেব 'রবীন্দ্রের সহিত একসন্ধ্যা যাপন' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা গেল যে এক সান্ধ্যসভার

য়ীট্‌স্ রবি বাবুর এই ধর্ম্মগীতগুলির ইংরাজী গদ্যানুবাদ আবৃত্তি করিবার কালে বলিয়াছেন যে ভক্তির দিক হইতে এ গুলি টমাস্ এ, কেম্পিসের রচনার সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু কবিত্বের দিক্ হইতে,—প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিবিষ্টতা ও তন্ময়তার দিক্ হইতে—ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন কিট্‌স্ শেলি ওয়ার্ডস্বার্থের ভাবনিগূঢ়, সৌন্দর্য্যানুভূতিময় কাব্যের কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কবি য়ীট্‌সের এই অভিমত পাঠ করিয়া আমার স্মরণে পড়িতেছে, একদা কোন ভক্তিভাজন ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন —যে গান আমাদের অন্তরে দুঃসহ পাপবোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা না জাগায়, সে গান উপাসনাকে পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম নয়। কবিত্বের ভাষা শ্রুতিমধুর, সৌন্দর্য্যবোধকে সে তৃপ্তিদান করে বটে—কিন্তু তাহার সেই শরবৎ ঋজুগতি (Directness) নাই যাহা একেবারেই গিয়া ঈশ্বরের চরণে উপনীত হয়। আমরা যে কত অকিঞ্চন, কত দীনহীন এবং ঈশ্বরের করুণা যে কি অপার—এই দুই ভাব যুগপৎ যে গানে ব্যক্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীত। রবি বাবুর গানে কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই ব্যাকুলতার সুর নাই।

আর একজন ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বেকার গান যেমন 'বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে' যেমন 'আমি হে তব কৃপার ভিখারী,' কিম্বা সেই পূর্ব্বেকার সুরে অল্প বয়সে রবি বাবু নিজে যে সকল গান বাঁধিয়াছিলেন, যেমন 'শুনেছে তোমার নাম' বা 'অন্ধজনে দেহ আলো' প্রভৃতি—তাহা তাঁহার আধুনিক গানগুলির চেয়ে অনেক বেশি মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার এখনকার গান কানের উপর দিয়াই ভাসিয়া যায়, হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায় না।

য়ীট্‌সের মত এবং ইহাদের মতে যে পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহার ভিতরকার কারণটা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। য়ীট্‌স যে শুধু কবিত্বের দিক্ হইতে ভাল বলিয়াছেন আমার তাহা মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে টমাস্ এ, কেম্পিসের গ্রন্থের সঙ্গে এবং প্রাচীন হিব্রু ঋষিদের ভক্তিগাথার সঙ্গে তিনি রবি বাবুর এ সকল গান ও কবিতার তুলনাই উত্থাপন করিতেন না। পক্ষান্তরে যে ধর্ম্মাচার্য্যের কথা বলিলাম, তিনি একজন ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধক,—তাঁহার হৃদয়কে যখন রবি বাবুর আধুনিক ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি ভরিয়া দেয় নাই, তখন তাহার কারণটা কি তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা এ সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ সত্য বিচারে গিয়া পৌঁছিতে পারিব বলিয়া ভরসা হয়।

এই আমি যে বসিয়া লিখিতেছি, আমার সম্মুখে বর্ষার জলসিক্ত কাননে কত শুভ্র ফুলই ফুটিয়াছে দেখিতেছি। যেন শ্যামলদুকূলপরা ছোট ছোট বনকন্যাদের কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ পরাইয়া দিয়াছে। আমি দেখিতেছি ঐ প্রত্যেকটি পুষ্প যে তরুতে ফুটিয়াছে সেই সমস্ত তরুটরই সে প্রতিমা; উহার দণ্ডটি তরুকাণ্ডেরই মত, উহার দলে দলে কত শিরা উপশিরা ডালপালার মত কত সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, দলরাজি আবার পল্লবগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া কোথা হইতে এক আশ্চর্য্য সৌরভ এবং বর্ণলাভ করিয়াছে এবং আপনাদের সমস্ত বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কোন্ একটি ভাবী সফলতার বীজকোষকে গর্ভের মধ্যে আবৃত করিয়া একটির সঙ্গে একটি কেমন এক সুন্দর বন্ধনে মিলিত হইয়াছে! জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রকাশও কি ঠিক্ এইরূপ নয়? সমস্ত জীবনের হাসিকান্না ভোগ চপলতা হইতে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য কি বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্য, না পরিণামের স্বাতন্ত্র্য? আমার সমস্ত জীবন ভরিয়া আমি যে প্রকৃতির কত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, কত নরনারীর প্রণয়বন্ধনে কত হাসিকান্নার ভিতর দিয়া যাইতেছি, আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাকে দিয়া কত কি করাইতেছে, কত কল্যাণ ও অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়া জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া আমায় ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে; সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার উপর, অনুভাবের উপর আমার ভাবনা আমার কল্পনা কত রং মিশাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান কত গভীরতর মূলে ইহাদের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করিতেছে—এই তো দেখিতেছি আমার জীবনের লীলা—কিন্তু আমার ধর্ম্মবোধ কি এই লীলার অন্তর্গত নয়? সে কি ইহাকে একপাশে সরাইয়া দিয়া তবে প্রকাশ পাইবে? সে কি এই বিচিত্র ডালপালাময় জীবনতরুটিরই শাখাগ্রভাগে ফুলের মত ফুটিবে না? এই সমস্তকেই রূপান্তরিত করিয়া ভগবৎপ্রসাদের একটি সুগন্ধ হিল্লোল এবং নানা রঙের এক আনন্দতরঙ্গ বহাইবে না?

অনেকেই জীবন হইতে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপ পরিণামের স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখেন না, কিন্তু বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্যরূপেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখে যতই অস্বীকার করুন, তাঁহারা সমস্ত জীবনের গান শুনিতে এবং শুনাইতে ভয় পান এবং জীবনটাকে অত্যন্ত কৃশমলিন, অত্যন্ত পাপজীর্ণ কল্পনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াও থাকেন। জীবনের বিচিত্র রাগ—সৌন্দর্য্যবোধের রাগ, মাধুর্য্যের রাগ, কল্যাণের রাগ, কল্পনার রাগ, ভাবের রাগ—এ সমস্ত রাগ এবং রাগিণীর কোন সার্থকতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না; তাঁহারা রাগবর্জ্জিত

রসবর্জ্জিত নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মত,—শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ের মত তাঁহাদের কাছে ভাল এবং মন্দ একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট; কারণ, কি যে ভাল এবং কি যে মন্দ তাহা কিনা কতকগুলি বাঁধা বাহিরের নিয়মের উপরই নির্ভর করে। জীবনের অভিব্যক্তিতে যে বাঁধা ভাল দেখিতে দেখিতে কোন্ মন্দের মুক্তক্ষেত্রে একেবারে মত্ত অশ্বের মত রাশ আল্‌গা করিয়া দেয় এবং মন্দও যে কি বিচিত্র উপায়ে ভাল হইয়া উঠে, মনুষ্য-প্রকৃতির এ সকল নিগূঢ় গুহাগতির মধ্যে তাঁহারা কোনদিনই প্রবেশ করেন না। এ কথা মনেও আনেন না যে, প্রবৃত্তির ঝড় মানুষের মধ্যে অনিবার্য্যরূপেই জাগে, কিন্তু তাহারি ভিতর দিয়াইতো ভোগবিরত অচঞ্চল শান্তির মধ্যে মানুষ আবার উত্তীর্ণ হয়। পঙ্ককে দেখিয়া পঙ্কজকে নিন্দা করে সেই, যে মূর্খ—কারণ যে আকাশে পঙ্ককে উদ্ভেদ করিয়া পঙ্কজ মাথা তোলে তাহা উজ্জ্বল-নির্ম্মল আকাশ, সেইখানেই সে আপনার সমস্ত সুরভিকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দেয়।

পাপ-বোধ ধর্ম্মকে সেই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবারই বোধ, জীবনকে ফুলে ফলে বিকশিত করিবার বোধ নয়। অবশ্য ধর্ম্মজীবনে তাহার কোন স্থান নাই এত বড় দুঃসাহসিকের কথা কোন্ মুখে বলিব, কিন্তু সে স্থান কেমনতর? না এই বর্ষার পূর্ব্বে যেমন উত্তপ্ত মাটিফাটা গ্রীষ্ম গিয়াছে, তাহারি মত। গ্রীষ্মের শোষণই যে বর্ষার মেঘকে জন্মদান করিয়াছে। গ্রীষ্মের ঝড়ই যে তাহাকে দিক্‌দিগন্তে চালিত করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, গ্রীষ্মের তাপ মাটীর আগাছা-পরগাছাকে শুকাইয়া মাটীর সমস্ত দূষিত বীজকে দগ্ধ করিয়া ভূমিকে ফলধারণযোগ্য করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মের পরিণামই যে বর্ষা, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও যেমন সে কথা আমাদের অত্যন্ত জানা, তেমনি পাপবোধের শোষণ ও দাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আনন্দ না জাগে, যদি না জানি যে এই জীবনেরই উপর আমার ফুল ফুটিবে, গন্ধ ছুটিবে, বর্ণ ধরিবে, মধুমক্ষিকার মেলা বসিবে, তবেত মারা গেলাম! তবে যে দাহ দাহই থাকিল, বর্ষণের মেঘকে সে তৈরি করিল কোথায়? বৈরাগ্য এবং রাগ, পাপের দাহ এবং সান্ত্বনার সুধা একই সময়ে আসা চাই, তবেই প্রাণ বাঁচে, নহিলে সমস্তই কি ভয়ঙ্কর কালো, কি শূন্য, কি অন্ধকারময়!

শুধু 'না'র দিক্ দিয়া মানুষের কোন ভাল করা যায় না—'হাঁ' চাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম এখন যে পরিবর্ত্তনের দিকে চলিয়াছে, তাহাতে সে এই 'হাঁ'র দিক্‌টাকেই বড় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু তাহার ইতিহাসে বরাবরই এই ভাবাত্মক দিক্‌টার অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। সে 'প্রেমে মুক্তি' বলিয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমটার প্রকাশ সমস্ত জীবনের মধ্যে যে কি রকম তাহার কোন আভাস দেয় নাই। ব্রাউনিং প্রভৃতি আধুনিক কবির কাব্যের মধ্যে বরং খানিকটা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কারণ তাঁহারা 'না'কে একেবারে অস্বীকার করিয়া জীবনের ভিতর হইতেই ধর্ম্মের ফুলকে ফুটাইয়াছেন—সমস্তকেই 'হাঁ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। Everlasting yea, চিরন্তন 'হাঁ'। সেইজন্য ব্রাউনিংএর মধ্যে পাপবোধ যথেষ্ট নাই এমন অপবাদও কেহ কেহ দিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলনাদির মধ্যে এই কথাটাই সত্য যে খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টান মানুষের আজিও পূরা বনিবনাও হয় নাই। সে মানুষ জীবনের সম্ভোগে ভরপুর আর তাহার ধর্ম্ম জীবনের আনন্দকে সৌন্দর্য্যভোগকে ডরাইয়া চলে। এই কারণে সে মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম এখনও প্রতিদিনের প্রতি কাজের, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের, অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই; সে অনেকটা পরিমাণে রবিবারের এবং গির্জ্জার জিনিস হইয়া আছে। অবশ্য সাহিত্য এবং শিল্প তাহাকে ক্রমাগত জীবনের ভিতরের দিক্ হইতে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনায় রত রহিয়াছে।

আমার বিশ্বাস যে কবিরাই জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের বিচ্ছেদকে ঘুচাইয়া দেন। তাঁহারাই জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যকে ঐ পরিণামের স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখান। তাঁহাদের চাপো, আর মার, আর গাল দাও—জীবনের আনন্দকে বাদ দিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিতে তাঁহারা কোনমতেই পারিবেন না।

> নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়ে;
> হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
> তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর একি চপলতা!
> কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা
> কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
> ভুলাস্ এ সংসারের সহস্র অলসে!
> দিয়াছি উত্তর তাঁরে, ওগো পক্ককেশ,
> আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ!
> যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্ত-বেদনায়
> ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়
> দিয়াছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
> সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান!

ইহারি জুড়ি কবিতা ব্রাউনিংয়ের "ফ্রালিপো লিপি"। ফ্রালিপো লিপি এক মধ্যযুগীয় চিত্রকর। তিনি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এক মঠে ছিলেন, কিন্তু তাহাদের অনুমতিক্রমে কেবল স্বর্গের দেবদূত আর পরী এবং

অন্যান্য কাল্পনিক ছবি না আঁকিয়া মধ্যে মধ্যে জীবনের আনন্দে রাজপথের জীবন্ত নরনারীদের ছবি আঁকিয়া ফেলিতেন। এবং মঠের পক্ককেশ সন্ন্যাসীদের এই উত্তরই দিতেন,—আমার তুলিতে সাজে তাঁহারি আদেশ!

আমাদের ভারতবর্ষে জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের যে তেমনতর বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাহারও প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, কবি এবং সাধক ছিলেন একাধারে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার অবসানকালে শক্তিপূজা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাবপ্লাবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই; বাংলা গীত সাহিত্যে বৈষ্ণবই একা রাজত্ব করিতেছে।

বৈদিক ঋষিরা কবি, উপনিষদকারগণ কবি, কবীর নানক দাদূ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর কবি—সুতরাং কেমন করিয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্য রূপরসের দাবীকে অগ্রাহ্য করিবে, বিশ্বসৌন্দর্য্যকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসেও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে একসময়ে পাপ-বোধ সকল রস ও সৌন্দর্য্য হইতে ধর্ম্মকে সরাইয়া লইয়া অত্যন্ত একদেশবর্ত্তী, শুষ্ক এক পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এখানেও এক মহাকবির গান সেই ধর্ম্মকে সেই একদেশের অতিপ্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে ভারতের চিরন্তন রসসাধনা ভক্তিসাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতেছে।

ম্যাক্লিফ্ সাহেব "শিখধর্ম্ম" নামক তাঁহার রচিত গ্রন্থে গুরুনানকের যে সকল ভজন সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং ক্ষিতিমোহন বাবু ওয়েষ্টকোট প্রভৃতির উপর নির্ভর না করিবা কবীরের যে বাক্যাবলী মূল হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে একটি কথা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্গে আর এই ধর্ম্মবাক্যগুলি ভাবে, রসে, প্রকাশে, এমন কি অনেক সময় উপমা অলঙ্কারের সাদৃশ্যেও এক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়; অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

কহৈঁ কবীর, বিছুড় নহিঁ মিলিহো
জ্যোঁ তরবর ছোড় বনমাধরী—

"কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবেনা—তেমনি তিনি বিচ্ছিন্নভাবে মিলিবেন না।" ঐ একই কথা!

কবীর, নানক প্রভৃতি ভক্তদের সমস্ত গান পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়, কিন্তু জীবনের উপর ফুল ফোটানোর উৎসবের গান। আমারি ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমার জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য অবাধে ফুটিতেছে—তাঁহাদের গান এই আনন্দের সুরে বাঁধা। য়া ঘট ভীতর চন্দ্রসুরহৈঁ য়াহী মেঁ নৌলখতারা—আমারি মধ্যে চন্দ্রসূর্য্য, আমারি মধ্যে নব লক্ষ তারা প্রকাশিত—(কবীর)। আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে—(রবীন্দ্রনাথ)। সেইজন্য—যাবহী মুরত বীচ অমূরত, মুরতকী বলিহারী—সকল মূর্ত্তিরই মধ্যে অমূর্ত্ত—বলিহারী যাই সকল মূর্ত্তির (কবীর)। আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি—(রবীন্দ্রনাথ)! এইরূপে দেখা যাইবে যে ইহাঁদের গানের ভিতরকার তত্ত্বটিই এই—যে বিশ্বকে কোথাও বাদ দেওয়া নয়, রূপকে কোথাও অস্বীকার করা নয় কিন্তু আত্মার আনন্দের দ্বারা সমস্তকে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করা। আশ্চর্য্য ইহাদের উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ইহাদের আনন্দোদ্বোধন এবং রসানুভূতি—এমন আশ্চর্য্য কবিতা কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

কবি য়ীট্স্ কেন, ইউরোপীয় কোন ভাবুকই আজও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে এই মধুর উৎসটির সংবাদ পান নাই। তাঁহারা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত পাইয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং এক নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারের যেমন আনন্দ, তেমনি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে মাণিক তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সে যে একটি আধটি নয়—ভারতবর্ষের ভাবসমুদ্রের তলায় সে যে কত যুগ যুগান্তর হইতে কত বিচিত্ররূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, সে খবর যে দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেদিন বিশ্বসাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীতে এক নূতন সুরের আবির্ভাব ঘটিবে। হয়ত ঐকতান সঙ্গীত যাহার অভাবে হইতে পারিতেছেনা সেই সব-মেলানো সববেসুরা-ডোবানো সুরই আসিয়া সকল বিচ্ছিন্ন গীতকে মিলিত করিয়া সকল মানবকে এক আনন্দসভায় আহ্বান করিবে। সেদিন দূরে নাই। বিবাহের প্রথম বাঁশীটি বাজিয়াছে—ঐ একটি সানাইয়ের করুণমধুর রাগিণী। পূর্ব্ব গগনকে প্লাবিত করিয়া এখন জীবনের সায়াহ্নে পশ্চিমগগনের বিজয়গৌরবচ্ছটাকে সে সুধাসিক্ত করিতে গিয়াছে। রাত্রি আসন্ন—আবার অরুণোদয়ের অপেক্ষায় সবাই বসিয়া আছে—এ অরুণোদয় সমস্ত মানুষের সম্মিলিত জাগরণ। ইতিমধ্যে, "watchman, what of the night?"

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ভক্তবাণী।

(আমিয়েল)

হে প্রভু, হে অন্তরতম, তোমাকে লাভ করাই মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা। আমাদের দেহমনের সমগ্র শক্তি, আমাদের অবস্থার অপূর্ব্ব গতি সেই পরম সৌভাগ্য অর্জ্জনের বিভিন্ন উপায়, সেই পরমামৃত আস্বাদনের বিচিত্র চেষ্টা। ক্ষণিক এবং ক্ষণভঙ্গুরের মোহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, চিরন্তনের সহিত চিরমিলনে আবদ্ধ হইতে দাও—ইহা ভিন্ন যাহা কিছু তাহা যেন ঋণ স্বরূপ জানিয়া সন্তর্পণে সম্ভোগ করিতে পারি। আরাধনা অর্চ্চনা, উপলব্ধি, অনুভব, গ্রহণ, দান এবং কর্ত্তব্যপালন, ইহাই জীবনের অনুশাসন এবং কার্য্য, পরম সুখ এবং চরম স্বর্গ। সে বিধান পালন করিতে যদি মৃত্যুকে বরণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়। আত্মার অন্তরতম প্রদেশে শান্তি সঞ্চয় কর—স্বার্থ পরাভূত হউক, ঈশ্বর সান্নিধ্যে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত জীবন আনন্দ-আধার হউক, আপন ক্ষীণ শক্তির প্রতি আর নির্ভর করিও না, তোমার আয়ত্তাতীত ঘটনাবলি অসীম শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইতে দাও। জীবনের মনোমত পরিণতি লাভ করিবার জন্য মৃত্যু যদি অবসর দেয় তবে ত সৌভাগ্য, যদি তাহার আহ্বান সন্নিকট হইয়া থাকে তবে তাহাই অধিকতর সৌভাগ্য, যদি বা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয় তবে তাহাই দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শিরোধার্য্য করিয়া লও। জানিও বিশ্ববিধাতা তোমার বিষয়সুখের বিরোধী হইয়া, তোমার মহত্ত্ব, স্বার্থত্যাগ এবং পরম সন্তোষের পথ অবারিত করিয়া দিলেন। প্রত্যেক জীবনেই অন্তহীন মহিমার বীজ নিহিত আছে, সেই সর্ব্বময়, রসময়, সৌন্দর্য্যময়, আনন্দময় হইতে দূরে বসতি যখন অসম্ভব, তখন অন্তরের অন্তর দিয়া তাঁহার নিরতিশয় মধুর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া মানবজীবন চরিতার্থ কর।

* * * *

সেই পরমাশক্তির চরণে আপনাকে বিসর্জ্জন দাও। জীবনের পাত্র পূর্ণ করিয়া যখনই তিনি যে আনন্দ যে বিষাদ যে অমৃত যে গরল দান করিবেন তাহাই সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে গ্রহণ কর। সেই অপার করুণাময়কে আত্মায় আবাহন করিয়া লও। তাঁহার অমৃতরসে হৃদয়কে অভিষিক্ত কর, তোমার মানবহৃদয়ে বিশ্বদেবতার পবিত্র মন্দিরের স্থাপনা হউক। মঙ্গলকার্য্যে উৎসাহী হও, মানবভ্রাতাকে সুখী এবং উন্নতিশীল কর। স্বার্থ-চেষ্টা নিবৃত্ত হউক; তবেই দেখিবে জীবন এবং মরণ উভয়ই অপূর্ব্ব আনন্দময়।

যাহাকে আমরা বড় ভালবাসি সেও যখন আমাদিগকে ভুল বোঝে তখনই জীবন বিষময় হয়, প্রিয়জনের এই অনুভব-বিরোধ জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মুখে একটি করুণ বিষাদের ছায়াপাত করে, আত্মত্যাগীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতম দুঃখতম আঘাত আর কিছুই নাই—এই আঘাত-পীড়া মহাত্মা খৃষ্টের হৃদয় কতবার না মথিত করিয়াছে। হায় জগদীশ্বরের যদি ক্লেশবোধ থাকে তবে নিমেষে নিমেষে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে কত বেদনাই সহ্য করিতে হয়, সেই একমাত্র, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে আমরা কত ভুল বুঝি ও কত অল্প বুঝিতে পারি। হায় হায়, কখনো উদ্বেজিত না হইয়া, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, ধৈর্য্যের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ করুণ অন্তঃকরণে মুকুলের বিকাশ, অন্তঃকরণের প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া, ঈশ্বরের ন্যায় নিয়ত আশার ঔদার্য্যে নিরন্তর ভালবাসিতে পারা, এই ত জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

দেহের উপর আত্মার দৃপ্ত বিজয় ঘোষণার নামই মহত্ত্ব, আশঙ্কার পরাজয়, দারিদ্র্যের, বেদনার, বিপত্তির, রোগশোকের, বন্ধুহীনতার এমন কি মৃত্যুরও পরাভব এইখানে। বীর্য্য ব্যতীত যথার্থ মহত্ত্বের, ধর্ম্মের অস্তিত্ব কোথায়? জীবনের সকল সৎসাহসের কেন্দ্রীভূত অত্যুজ্জ্বল দীপ্ত আলোকের নামই মহত্ত্ব।

"দেবতা তোমার অন্তরাত্মায় যে বিশেষ বার্ত্তা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিবার মঙ্গল মুহূর্ত্ত যেন ব্যর্থ না হয়—এখনই তাহা ব্যক্ত কর, নতুবা তুমি চির অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এই তোমার অবসর, পৃথিবীর সম্মুখে তোমার আত্মার পরিমাপ প্রদান করো—তোমার ক্ষমতা কিম্বা অক্ষমতার পরিচয় প্রকাশিত হউক। অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া দাঁড়াও, কেবলমাত্র সংকল্প করিলে হইবে না, স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করো। তোমার শিক্ষানবিশি শেষ হইয়াছে, এখন দেখাও হে ভৃত্য, প্রভুদত্ত ক্ষমতার কি ব্যবহার করিলে। এই মুহূর্ত্তে তোমার বক্তব্য উচ্চারণ কর নতুবা চিরদিন মূক হইয়া থাকিতে হইবে।" প্রত্যেক মানবজীবনে আত্মার অন্তর-মন্দিরে প্রলয়কালের শেষ পিণাকের ন্যায় ধর্ম্মবুদ্ধির এই সুগম্ভীর আদেশ একবার ধ্বনিত হয়। তাহা ডাকিয়া ডাকিয়া বলে—বল তুমি প্রস্তুত আছ কিনা, প্রভুদত্ত ধনের হিসাব দাও, হিসাব দাও তোমার জীবনের রাত্রিদিন দীর্ঘ বৎসর মাসের, তোমার অবসর, তোমার শক্তি, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভা, এবং তোমার কৃত কার্য্যের। এই মঙ্গল মুহূর্ত্ত মহত্ত্ব-বিকাশের পুণ্য অবসর, মহদন্তঃকরণ

এবং দিব্য :প্রতিভাবানের অভিষেক—সৌভাগ্যের শুভলগ্ন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কৃষি-উন্নতির দৃষ্টান্ত।

(ডেনমার্ক)

সম্প্রতি মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের একখানি বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যাহারা য়ুরোপ ও আমেরিকার কোলাহলপূর্ণ নগরীর প্রান্তস্থিত শ্রীহীন কদর্য্য স্থানগুলি (Slums) না দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যসমাজের বিকৃতাবস্থা ও মানবচরিত্রের চরম দুর্গতির স্পষ্ট ছবি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। দারিদ্র্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভয়াবহ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজমান, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার মহানগরীতে দারিদ্র্য যেন একটা হৃদয়হীন রক্তপিপাসু যমদূতের মূর্ত্তি ধরিয়া আছে। স্খলিতচরিত্র, বিকারগ্রস্ত নরনারী পুঞ্জীভূত হইয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; মহানগরীর ধূলিআবর্ত্তের মধ্যে সহস্র নরনারী আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে—এইরূপ কত শত বালকবালিকা যুবকযুবতী মহানগরীর এক প্রান্তে পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনারাশির ন্যায় পড়িয়া আছে। বাড়ী নাই, ঘর নাই, আহার নাই, এমন কত সহস্র নরনারী রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মহানগরীর পাপ প্রলোভনের টানে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কে তার হিসাব রাখে? অথচ প্রতিবৎসর পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া কত শত শ্রমজীবী সহরে আশ্রয় গ্রহণ করে—ভাবে, সহরে অর্থাগমের নানা পথ খোলা আছে—এখানে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করা সহজ হইবে। কিন্তু হায়, অল্পকাল মধ্যেই তাহার অজ্ঞাতে মহানগরী তাহাকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। পল্লীগ্রামেও জমি ও সামান্য কিছু মূলধনের অভাবে, কোনো কোনো স্থলে, মিতশ্রমিক যন্ত্রাদির অভাবে শ্রমজীবিগণ চাষবাস করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না; আবার সহরে কোনো কারখানায় অস্থায়ী চাকরীর লোভে আসিয়াও তাহার দুর্গতির আর সীমা থাকে না—এমন করিয়া সে উভয় সঙ্কটের মাঝে স্ত্রীপুত্রপরিবারসহ হাবুডুবু খাইতে থাকে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও ইতালীর কৃষিবিদ্ পণ্ডিতগণ ও সমাজসংস্কারকগণ এই সকল জাতীয় সমস্যার মীমাংসা করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের উন্নতিকল্পে কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এলট্‌মেণ্ট বিল নামক একটি আইন পাশ হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ইহাতে আশানুরূপ ফল হয় নাই। অন্যান্য দেশাপেক্ষা এ বিষয়ে ফ্রান্স ও ডেনমার্কের বিধানই কৃতকার্য্য হইয়াছে। অবশ্য ফরাসীবিপ্লবের পর হইতেই ফ্রান্সের অধিকাংশ জমি সাধারণ কৃষকশ্রেণীর হস্তগত হইয়া আছে; অতএব ফরাসী-সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় নাই। এ বিষয়ে ডেনমার্কের সম্ভ্রান্ত স্বদেশসেবকগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায় দৃষ্টান্তস্থল। এই প্রবন্ধে ডেনমার্কে ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যা কি প্রণালীতে বৃদ্ধি করা হইল—এবং ইহার ফলে দেশের কৃষিকর্ম্ম কি রূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালে ডেনমার্কেও অল্পস্বল্প জমি লইয়া চাষবাস করে এমন জোতদার ছিল না; ইংলণ্ডের ন্যায় ডেনমার্কের জমি বড় বড় জমিদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং এই ধনীজমিদারগণ নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের সাহায্যে জমি চাষ করাইতেন—লাভের অংশ সম্পূর্ণই নিজেরা গ্রহণ করিতেন—শ্রমজীবীকে সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের সম্রাট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া সাধারণ প্রজার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি মন্ত্রণা-সভা গঠন করিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় সাধারণ প্রজার উন্নতির পথ খোলা হইল—জমিদার ও জায়গীরদারের হাতে সমস্ত জমি যাহাতে আবদ্ধ হইয়া না থাকে সে জন্য সভা নানাপ্রকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে ১৮৪৮ সালে ডেনমার্কে জমিসম্বন্ধীয় নূতন আইন জারি করা হইল—ইহার ফলে আজ ডেনমার্কে শতকরা নব্বুই জন কৃষক স্থায়ী প্রজাস্বত্ব উপভোগ করে; অপরের জমিতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া সামান্য পারিশ্রমিকে তাহাকে আর জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় না; তাহার নিজের ভূমিখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা সম্পূর্ণই তাহার নিজস্ব। জমি ভোগদখলের এই সুব্যবস্থাই ডেনমার্কের কৃষি-উন্নতির অন্যতম কারণ।

১৯০৯ সালে ডেনমার্কের রাজ-সভা ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি আইন মঞ্জুর করিয়াছেন। কর্ম্মিষ্ঠ সংস্বভাবাপন্ন, স্বাধীনচেতা, শ্রমজীবী যাহাতে সরকারের সাহায্যে অল্পস্বল্প জমি সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহার পথ খুলিয়া দেওয়াই ডেনমার্ক-গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মনোযোগের সহিত এই আইনের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিলে ডেনমার্কদেশীয়ের বিচক্ষণতা ও কর্ম্মোৎসাহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি উক্ত আইনের সারমর্ম্ম সংকলন করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ

করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, ডেনমার্ক রাজসভার মাননীয় সদস্যগণ কি গভীর ভাবে সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন; সামান্য ব্যাপারও তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারে নাই।

ডেনমার্কে ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শ্রমজীবিগণকে জীবিকা উপার্জ্জনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে রাজসভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এবং দেশপূজ্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রচারিত আইনের সারমর্ম্ম :—

(ক) ডেনমার্করাজসভার অনুমোদিত ও সম্রাট কর্ত্তৃক প্রচারিত আইন যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইয়া ডেনমার্কের প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধন করে এবং যাহাতে অভাবগ্রস্ত শ্রমজীবিকে স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের একটা সুযোগ দিতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা গঠন করিতে হইবে। প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত দুইটি বিশিষ্ট সভা ও সরকারী কৃষি-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া ছয় বৎসরের জন্য একটি সভা গঠিত হইবে; প্রত্যেক ছয় বৎসরান্তে সভার সভ্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইবে। আবশ্যক হইলে সভ্যগণ এক একটি প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন, প্রত্যেক বিভক্ত খণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে। সভ্যগণের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের ব্যয় সরকার হইতে দেওয়া হইবে; প্রত্যেক সভ্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীভাড়া ও সভার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে দৈনিক ৬ ক্রোণার অর্থাৎ প্রায় ৭৲ টাকা বেতন পাইবেন অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত জোতদারের নিকট হইতে সামান্য কিছু খরচা আদায় করা হইবে।

(খ) প্রধানতঃ চাষবাসই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, যাহারা সামান্য জমি চাষ করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করে, অথবা যাহারা অপরের কোনো কৃষিক্ষেত্রে মজুরী খাটিয়া "দিন-আনি-দিন-খাই"-ধরণের-জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে যে কোনো পুরুষ অথবা অবিবাহিত স্ত্রীলোক এই আইনানুযায়ী ব্যবস্থায় সত্ত্ববান। গ্রাম্য কারিকর, কুম্ভকার, ধীবর অথবা এমন কোনো শ্রমজীবী যাহারা আংশিক পরিমাণে চাষবাস করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করে, তাহারাও এই আইনানুযায়ী ব্যবস্থায় সত্ত্ববান।

(গ) এই আইনানুযায়ী সরকার হইতে জোত পাইতে হইলে দরখাস্তকারীকে প্রশংসা পত্রাদি সহ প্রাদেশিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার নিকট আবেদন করিতে করিতে হইবে। (১) দরখাস্তকারী ডেনমার্কের অধিবাসী হওয়া চাই। (২) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসরের উর্দ্ধে, পঞ্চাশ বৎসরের নিম্নে হওয়া চাই। (৩) দরখাস্তকারী কোনো লজ্জাজনক অপরাধের নিমিত্ত আদালতে শাস্তি ভোগ করে নাই এবং তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই—ইহা জানিতে হইবে। (৪) তাহার নিজগ্রামের দাতব্য-ডাক্তার হইতে অভাবের সময় সে যে সাহায্য পাইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ তাহার নিজের আয় হইতে শোধ করিতে পারিয়াছে কিনা ইহা জানিতে হইবে। (৫) ১৮ বৎসর বয়সের পর অন্তত চারি বৎসর কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। (৬) তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত আছেন—গ্রামস্থ এরূপ দুইটি বিশ্বস্ত লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি প্রশংসাপত্র পাওয়া চাই। ইহা জানা আবশ্যক যে সে মিতব্যয়ী সচ্চরিত্র ও কর্ম্মিষ্ঠ—জোতজমির উপযুক্ত তদ্বির করিতে পারিবে। (৭) এই আইনানুযায়ী যে পরিমাণ মূলধন থাকা আবশ্যক, তাহা ইহার আছে, কিন্তু তাহার নিজের গচ্ছিত টাকা জোত ক্রয় করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট নহে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রাদেশিক সভার নিকট আবেদন পৌঁছিবার পূর্ব্বে পল্লীসভা হইতে দরখাস্তকারী সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আবেদনপত্রের সহিত প্রাদেশিক সভার সভাপতির নিকট পাঠান হয়।

(ঘ) কোনো জোত নয় বিঘার কম হইতে পারিবে না।

(ঙ) প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড জমিকে স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হইবে; জমিখণ্ডের আয়তন হিসাব না করিয়া সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কেহ জমি ক্রয় করিতে সম্মত হইলে সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে জমি জমা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৯০৯ সালের জোত সম্বন্ধীয় আইনানুসারে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা হইল দলিলপত্রে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

(চ) আবেদনকারী (গ) ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলির সন্তোষজনক উত্তর সহ আবেদন করিলে তাহাকে জমি সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে; মালিকের নিকট হইতে আপোষে কিনিতে পারে এমন বিশেষ কোনো জমির সন্ধান যদি সে না জানে, তবে তাহাকে পল্লীসভায় আবেদন করিতে হইবে। উক্ত পল্লীসভা উপযুক্ত মূল্যে জমি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে। পল্লীসভা কৃতকার্য্য না হইলে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষদের জানান হইবে; তাহারা সরকারী খাষের জমি হইতে কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

(ছ) আবেদনকারী নিজের অথবা পল্লীসভার সহযোগিতায় কোনো বিশেষ ভূমিখণ্ড পছন্দ করিয়া এই আইনানুসারে দখল করিতে ইচ্ছা করিলে একখানি লিখিত আবেদনপত্র পল্লীসভার মন্তব্যযুক্ত (ক) ধারায় উল্লিখিত প্রাদেশিক সভার সভাপতির নিকট পাঠাইতে হইবে। নিয়মাবলীযুক্ত আবেদনপত্র পল্লীসভায় পাওয়া যাইবে; সমস্ত আবশ্যক সংবাদ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে এবং বিবরণের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রশংসাপত্রাদি দিতে হইবে। কত পরিমাণ জমি, কোন্ স্থানে, কত মূল্যে ক্রয় করা যায়, জমির কোন্ কোন্ স্থানে ঘর দুয়ার প্রস্তুত করিতে হইবে, বাসোপযোগী ঘর দুয়ারের জন্য কত টাকা আবশ্যক, কৃষিকার্য্যের প্রারম্ভেই বা কি কি জিনিষ প্রয়োজন ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া প্রাদেশিক সভার নিকট পাঠাইতে হইবে। ৬৫০০ ক্রোণার অর্থাৎ প্রায় ৭৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি একজন জোতদারকে দেওয়া যাইতে পারিবে না। দরখাস্তকারীর আবেদনপত্রের সঙ্গে পল্লীসভাতে একটি বিবরণী দিতে হইবে; উক্ত বিবরণীতে উক্ত জোত ও জোতদারের সম্বন্ধে পল্লীসভার বিস্তারিত অভিমত লিপি-বদ্ধ হইয়া থাকিবে। ক্রমশঃ—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

মধুমালতীর প্রজাপতি।

(১)

মধুমালতীর গায়ে আমরা একপ্রকার পোকা দেখিয়াছি, ইহাদের বর্ণ শৈশবে ঝাউগাছের গোড়ার রঙের মত কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ঈষৎ পীতাভ হইয়া যায়। ইহাদের দেহের উপরিভাগ (অর্থাৎ পিঠের দিক) নিম্নাংশ (অর্থাৎ পেটের তলের দিক) হইতে অনেক পালিস, কারণ পেটের তলে ও দুইপাশে খুব সূক্ষ্ম রোম আছে। সেই রোমগুলি সহজে দেখা যায় না, কিন্তু একটু নজর দিলে ধরা পড়ে। ইহাদের পা সর্ব্ব শুদ্ধ ষোলটি; কেন্নু প্রভৃতি পোকার পা যেমন পরস্পর পাশাপাশি সুশৃঙ্খলভাবে সাজান থাকে, ইহাদের পা তেমন করিয়া সাজান থাকে না। ইহাদের পিছেনের পা দুইটি রোহিত মৎস্যের লেজের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত। এই পায়ের কিছু ঊর্দ্ধে পর পর চারি জোড়া পা আছে, এগুলি পিছনের পায়ের মত নহে। এই চারি জোড়ার শেষের জোড়াটি অত্যন্ত ছোট, এই এক জোড়া পা ইহাদের বক্ষের কাছে থাকে। এই ছোট পায়ের কিছু ঊর্দ্ধে গলার কাছে দুই পাশে তিনটি করিয়া ছয়টি পা আছে, এই ছয়টি চেলা বিছের সম্মুখের পায়ের মত। এই ছয় পায়ের সাহায্যে পত্রভক্ষণের সময় ইহাদের অনেক সুবিধা হয়, ভিমরুলের মাথার মত বর্ণে এবং আকারে এই পোকার মাথার সহিত বিশেষ কোন প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না, যে টুকু প্রভেদ আছে তাহা সহজে ধরা যায় না, ইহাদের পিছনের পায়ের উপরের মাংস কিছু উঁচু। ইহারা দৈর্ঘ্যে আড়াই ইঞ্চি হয়; সময় সময় এতদপেক্ষাও দীর্ঘকায় দেখিয়াছি। রক্তপিপাসু জোঁক যেরকম ভঙ্গীতে স্বীয় শিকার ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসে ইহাদের চলনভঙ্গী ও ক্ষিপ্রতা বোধ করি তাহার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে। এইত গেল ইহাদের আকার, আয়তন, অবয়ব ও চলন-ভঙ্গীর কথা, এখন ইহাদের খাদ্য সম্বন্ধে বলিব।

খাদ্য ও তাহার সময়।

ইহাদের খাদ্য মধুমালতীর কচি সরু ডাঁটা ও নরম পাতা। পাতা অপেক্ষা কচি ডাঁটাই ইহারা বেশীর ভাগ ভক্ষণ করিয়া থাকে। মধুমালতীর পাতা এবং ডাঁটা ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদের পাতা বা ডাঁটা ইহাদিগকে খাইতে দেখি নাই, খাইতে দিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। দিনের বেলায় ইহারা আরামে নিদ্রা যায়। ইহারা যখন নিদ্রা যায় তখন লতার গায় এমনভাবে আঁটিয়া থাকে যে সহজে তাহা হইতে ছাড়াইয়া লওয়া কঠিন। তাছাড়া লতার গায় যখন ইহারা লাগিয়া থাকে তখন ইহাদিগকে লতার শুষ্ক অংশ হইতে সহজে বাছিয়া বাহির করাও শক্ত, কারণ লতার যে জায়গায় ইহারা সংলগ্ন থাকে, বোধ হয় যেন সে অংশটি শুকাইয়া গিয়াছে।

ইহাদের এই যে আত্মরক্ষার উপায়টি ইহা নেহাত মন্দনয়,—পাখী এবং অন্যান্য শত্রুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জনাই ঈশ্বর ইহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। সারা দিন নিদ্রার পর রাত্রিতে ইহারা ভক্ষণ-কার্য্যে মন দেয়, ও স্বল্প সময়ের মধ্যেই মধুমালতীর অনেক পাতা এবং ডাঁটা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে।

গুটি ও তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল।

ইহাদিগকে বর্ষারম্ভে গুটি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। ইহাদের গুটির নির্ম্মাণ-কৌশল ভারি চমৎকার। গুটি নির্ম্মাণ করিবার সময়ের একদিন পূর্ব্ব হইতে

ইহারা আহার এবং চলা ফেরা বন্ধ করিয়া নিঝুম ভাবে বসিয়া থাকে। দ্বিতীয় দিনে কয়েকটি পাতাকে স্বীয় মুখের লালার সাহায্যে সাজাইয়া পরস্পর সংবদ্ধ করে ও একটি ছোট ঘরের মতন তৈরি করে। পরে ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে ঘরের সমুদয় ছিদ্র বা ফাঁক বন্ধ করিয়া দেয়। এই খানেই যে কারি-করি শেষ হইল তাহা নয়। ঐ পত্রাবরণের মধ্যে পোকাটি স্বীয় মুখের লালার সাহায্যে চমৎকার একটি জাল প্রস্তুত করে ও সেই জালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া থাকে। এই অবস্থায় একদিবস থাকিয়া সাপের মত খোলস পরিত্যাগ করে, তখন হইতে ধীরে ধীরে পোকাটি গুটি হইতে থাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পোকাটি তন্মধ্যে চমৎকার একটি গুটি হইয়া যায়, এই গুটির বর্ণ লাল, আকার সন্ধ্যা ফুলের গুটিপোকার গুটির মত, তবে দৈর্ঘ্যে একটু বড়।

প্রজাপতি।

এই গুটির মধ্যে ১২ দিনের দিন পোকাটি সম্পূর্ণ প্রজাপতির আকার প্রাপ্ত হয়, ও সেই দিন সহসা আবরণটি ফাটিয়া গিয়া তন্মধ্য হইতে একটি প্রজাপতি বাহির হয়। এই সময় প্রজাপতিটিকে দেখিতে একটা ডানা-কাটা পাখীর বাচ্ছার মত। অবশ্য অতবড় নয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রজাপতিটির পাখ্না এবং সকল অবয়ব সম্পূর্ণ বাড়িয়া যায় তখন আর তাহাকে প্রজাপতি নয় বলিয়া মনে হয় না। এই প্রজাপতির বর্ণ কাল ছাইয়ের মত, পেটের তল এবং পিঠ এবং বক্ষ-দেশ কটা। ইহাদের ছয়টি পা আছে, পাগুলির গায় করাতের কাঁটার মত ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। ইহাদের চোখের বর্ণ কটা, পাখনার গড়ন চ্যাংমাছের ডানার মত—তাহাতে অনেক গুঁড়া আছে। ইহারা সাধারণত রাত্রিতে উড়িয়া বেড়ায়, দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে।

সুধাকান্ত।

তসরের গুটিপোকার প্রজাপতি

(২) (সমালোচনা)

বিগত বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বংশু তসরের "গুটিপোকা ও প্রজাপতি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

প্রজাপতির পুরুষ ও স্ত্রীজাতি নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "পুরুষেরা আকারে স্ত্রী অপেক্ষা ছোট এবং গায়ের গুঁড়ার রং অল্প সবুজ; কিন্তু স্ত্রীরা খুব বড় হয়। ইহাদের শরীরের গুঁড়ার রং হল্‌দে হয়। সেইজন্য ইহা-দিগকে হলদে এবং পুরুষদিগকে অল্প সবুজ দেখা যায়।"

প্রজাপতির স্ত্রী, পুরুষ নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্নতার যে কয়েকটি লক্ষণ লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া লোকে সহজে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, সকল পুরুষ প্রজাপতিই যে একই আয়তনের হইবে এমন কোন কথা নাই, কোনটি বা ছোট কোনটি বা বড় হয়। কাজেই যদি দৈবক্রমে দুই পুরুষ প্রজাপতি এক জায়গায় সমবেত হয় এবং সেখানে যদি উক্ত প্রবন্ধ-পাঠকদের মধ্যে কেহ উপস্থিত থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই দুইটার মধ্যে যে প্রজাপতিটি বড় তাহাকে স্ত্রী প্রজাপতি বলিয়া ঠাওরাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষ প্রজাপতির গায়ের গুঁড়ার রং অল্প সবুজ হয়। এবং স্ত্রী প্রজাপতির গুঁড়ার রং ঈষৎ হল্‌দে, ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

তসরের গুটিপোকার প্রজাপতির মধ্যে যাহার বর্ণ শালফলের বর্ণের মত এবং আয়তনে বৃহৎ তাহাই স্ত্রী প্রজাপতি। পুরুষ প্রজাপতির আয়তন ছোট এবং বর্ণ সম্পূর্ণ গাঢ় বাদামি। পুরুষ প্রজাপতির পক্ষদ্বয়, যাহা উপরের দিকে স্থাপিত তাহার গড়ন স্ত্রী প্রজাপতির উপরের পক্ষদ্বয়ের গড়ন হইতে একটু লম্বা। তারপর পুরুষ প্রজাপতির চোখের কাছের দুইটি শৃঙ্গ অবিকল কচি তেঁতুল পাতার মত। স্ত্রী প্রজাপতির যদিও দুইটি শৃঙ্গ আছে তথাপি তাহা পুরুষ প্রজাপতির শৃঙ্গ হইতে প্রস্থে অনেক ছোট। স্ত্রী প্রজাপতির পেট পুরুষ প্রজা-পতির পেট অপেক্ষা অনেক মোটা। এবং ইহাদের পেটের তলের বর্ণ ছাইয়ের মত। পুরুষ প্রজাপতির পেটের তলের বর্ণ লাল। এই প্রজাপতির চারিটি পাখনায় যে চারিটি স্বচ্ছ বোতামের মত চক্র থাকে তাহার বেড়ের মধ্যভাগ হল্‌দে। স্ত্রীর সবুজ।

সুধাকান্ত।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৯ই আষাঢ়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়দ্বয়ের বেদীগ্রহণ করিবার কথা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থ থাকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর কার্য্য একাকী করিয়াছিলেন। প্রণাম, উদ্বোধন ও নিয়মিত উপাসনা সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার পর স্বাধ্যায়ের শেষে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় "আধ্যাত্মিক রাজ্য" শীর্ষক একটি নিবেদন পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়, ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ নিজ জীবনের সামগ্রী করিয়া তাহা প্রচারের জন্য উৎসাহের সহিত যত্নশীল হইতে সকলকে অনুরোধ করেন। উপদেশ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলি সময়, উপাসনা ও বক্তৃতাদির উপযোগী হওয়ায় উৎসব মধুর হইয়াছিল।

—*—

IMPERIAL

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথের **"জীবন-স্মৃতি"** বহুলপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের নানাস্থানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাইশ খানি একেবারে নূতন ধরণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানিকে কাগজে, চিত্রে, ছাপায়, বাঁধাই—সকল দিকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রকাশক চেষ্টার ও অর্থব্যয়ের কোনো ত্রুটি রাখেন নাই।

"জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে কবিজীবনের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তাহাকে আরো স্পষ্ট, আরো সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে কবিবরের লিখিত বহুদিনসঞ্চিত রাশিকৃত চিঠিপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া **"ছিন্নপত্র"** নামে একখানি গ্রন্থও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাংলা দেশের বাংলাকবির যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থ দুইখানিতে পাওয়া যাইবে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ দুইখানির আদর হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জীবন-স্মৃতির মূল্য ৫৲ টাকা ও ছিন্নপত্রের মূল্য ৩৲ টাকা।

বিশেষ সুবিধা—৩০শে আশ্বিন মধ্যে দুইখানি পুস্তকের জন্য আদেশপত্র একনামে একত্র পাঠাইলে ৮৲ আট টাকা স্থলে ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকায় দেওয়া যাইবে।

নিম্নে আদেশপত্র দেওয়া হইল। অবিলম্বে উহা প্রেরণ করুন।

আদেশপত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু—

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত দুইখানি, গ্রন্থ "জীবন-স্মৃতি" / "ছিন্নপত্র" .... সেট্ ভি-পি-তে / লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—

১৩১ সাল, তারিখ .... ।

নাম————————

ঠিকানা————————

দ্রষ্টব্যঃ—আগামী ৩০শে আশ্বিন মধ্যে প্রকাশকের নিকট একনামে দুইখানি গ্রন্থের আদেশ পত্র পৌঁছিলে ৮৲ টাকা স্থলে ৬॥০ টাকায় দেওয়া যাইবে। কলিকাতার অর্ডার লোকমারফৎ ও মফস্বলের অর্ডার ভি-পি-তে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে।

ধর্ম্মের অধিকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ৵০ আনা। ডাকমাশুল ৴১০।

ধর্ম্মশিক্ষা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ।

মূল্য ৴০ আনা; ২০ খানি ১৲ টাকা।

২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ প্রবাসী কার্য্যালয়ে ও আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী।

(ইংরাজি)

আর, এন্, সমাদ্দার প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। সংবাদ-পত্রে প্রশংসিত, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
* আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
* ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
* ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	৷০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷০
* সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
* বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷০
* বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
* ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৶০
* কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৩১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
* আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
* পরলোক ও মুক্তি	৶০
* দশোপদেশ	॥০
* মাঘোৎসব	॥০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (২য় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা)	২৷০
কাগজে বাঁধা	১৸০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞা· ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৶০
* ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০
* আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৶০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	৷০
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
* হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	৷০
ধর্ম্মমাল	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	৷০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১৷০
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	॥৶০

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া যাইবে।

শান্তি ঔষধালয়।

স্থলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বৃহৎ কারখানা।

বিশুদ্ধ খাঁটী কবিরাজি ঔষধ আশ্চর্য্য সস্তা, চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৩৲, স্বর্ণসিন্দুর ১ ভরি ৫৲ টাকা, কামেশ্বর মোদক /১ সের ৪৲, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত /১ সের ১২৲ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নিকট পত্র লিখিলেই ক্যাটলগ, ব্যবস্থা বা ঔষধ যাহার যাহা আবশ্যক অতি। সত্বর পাইবেন

রক্তদুষ্টির মহৌষধ—"অনন্তমূলাসব সালসা"—মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৸০ বার আনা।

অর্ডারদাতাগণ আমার নিজ নামে অর্ডার দিবেন এবং আমার নামটি পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতানন্দ গুপ্ত, কাব্যবিনোদ,
পটুয়াটুলী, ঢাক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮৩১ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।"

বর্ত্তমান।

অশোকের দিন গিয়েছে সে কবে
আম্রমুকুল সনে,
ফুটিয়া যে ফুল রূপের গরবে
ঝরিবে রাখে না মনে!

নূপুর নিনাদ গিয়াছে থামিয়া
সে রাঙা চরণ কোথা?
ফলের মাঝারে ফুলের অমিয়া
সঁপিয়াছে মধুরতা!

উষার লাগিয়া নিশার তিমিরে
শেফালি ফুটিল আজি
পুণ্য করিল সুরভি শিশিরে
পূজার দূর্ব্বারাজি!

অমল পাঁপড়ি রাঙাবৃন্ত তার
অশোকের স্মৃতি জাগে,
অতীতের সুখ আশার মাঝারে
আশ্বাস অনুরাগে!

ঘনাইয়া আসে কুয়াশার ধ্যান
ম্লান হয় বসুন্ধরা
আকাশে আজিকে মেঘ তিরোধান
অযুত নক্ষত্রে ভরা!

২৩।১০।১১। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ।

(বিলাতের পত্র)

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম এইরূপ আমার মনে হইল। এদেশের যাঁহারা লেখক যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম, ততই অনুভব করিতে লাগিলাম ইঁহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারো সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ঙ্কর ব্যগ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে! সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মত বহুদূরে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে কিন্তু কোথায় কোন্ পর্ব্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরণাগুলি পাগলের মত ব্যস্ত হইয়া ডাহিনে বাঁয়ে নুড়ি পাথরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠুলিয়া কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্দ্ধশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে,

ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষাশালায়, পার্লামেণ্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। "চাই, আরো চাই," দেশের মর্ম্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পৌঁছিতেছে। এত বড় একটা ডাকে কাহারো সবুর সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; সে লোকের উপর আরোর তাগিদ পড়িল; খেজুর গাছের মত বৎসরের পর বৎসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনোবারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে, ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহবা পায়ে হাঁটিয়া চলে কেহ বা মোটর গাড়ি হাঁকায়, কেহ বা মজুরি করে কেহবা মহাজনী করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোর বেলা হইতে রাত দুপর পর্য্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নূতন নহে। আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্দ্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি এ দেশের চিন্তার হাটে কি ভয়ঙ্কর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয় খুব অন্তরঙ্গও নয়; ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেক্ট্রিক আলোর তারের মত সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবামাত্র তখনি জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া চকমকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি; বিশেষ কোনো তাগিদ নাই সুতরাং দেরি হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্ সাহেবের দুই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম ইঁহার চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মত যেমন ঝকমক্ করে তেমনি তাহা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন ইঁহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল সংসারে খরতর বুদ্ধি জিনিষটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয় কিন্তু তাহার সংস্রব হয়ত আরামের নহে।

যাহা হউক সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইঁহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জন্য আলাপ পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম যখন দেখা গেল মানুষটি সজারু-জাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম ইঁহার প্রখরতা চিন্তায় কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইঁহার আন্তরিক দরদ আছে; অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্ব্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়িবাজি করিয়া সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিষ। মানুষ এখানে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুর শস্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভাল হয় না, জমিতে সর্ব্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্য্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্ব্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পুরাপরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরলবসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না; এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয় ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়-মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেই জন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগ্নের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম ইঁহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনা-

শক্তির অবলম্বন মানুষ; এইজন্য তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মত কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইঁহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মত নহে তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আর একটা জিনিষ দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে ইঁহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্ত্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ইঁহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইঁহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে চারিদিকের ঠেলায় ইঁহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইঁহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইঁহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ কথার কল্লোল কেবলি নানাদিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্ব্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে তাহা চিন্তার জোর। ইঁহার অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভাল লাগিবার জিনিষ সেটাকে ভাল লাগিতে ইঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না—সে সম্বন্ধে ইঁহাকে আর কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইঁহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইঁহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহবা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় একক্ষেত্রে মিলিবার মত লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইঁহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইঁহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাক্কাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইঁহাদের দেশে ভাবনা জিনিষটা চলার মুখেই আছে, তাহার চাকা আপনিই সরে; মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইঁহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায় এবং সেই ধারা দ্রুত গতিশীল।

যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইঁহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে এ সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিষ, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু মানুষের মন কৃপণতা করিয়া কোনো বড় ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভাল করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড় রকমের চাষ হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয় তাহাতে অনেকটা নিষ্ফল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজন্য চিন্তার চর্চ্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিনদুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার নাম লোয়েস্ ডিকিন্সন্। ইনিই "জন্ চীনাম্যানের পত্র" বইখানির লেখক। সে বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারিদিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে জাগিয়া উঠিবে এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই চিনাম্যানের পত্র বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তখন জানি-

তাম সে বইখানি সত্যই চিনামেনের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চিনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি ভাবুক অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিন্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জ্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা কোনো বিশেষ বিষয়ের বইপড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না; ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসন্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে; সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে; তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারিদিকে যে একটা আলাপের বসন্ত হাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগদিগন্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহৃদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। ইঁহার সঙ্গে একসময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত অধ্যাপক রাসেল সাহেব আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারো মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায় কাহারো মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে সেইটে আমার কাছে সব চেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম। সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত প্রাচীন-তরু-সভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ব, দর্শন, সকলরকম জিনিষই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড় রমণীয়। একদিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশজোড়া নিস্তব্ধতা, আর একদিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্ব্বতমালা স্থির নিশ্চল গাম্ভীর্য্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছ্বাস কেবলি প্রশ্ন করিতেছে এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মানুষের মধ্যেই বাণী আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে, এই বাণী স্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সে দিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতি বিপুল। অনন্ত আকাশে সেই মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে; সেই আলোকের আবর্ত্ত চঞ্চল, তাহা সর্ব্বদা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিখায় কোথাও বা স্ফুলিঙ্গে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্য কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী। মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলি বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্য্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠের কথাবার্ত্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতেছিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিতা।*

বিশ্বজগতে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে প্রয়োজনের দিক এবং আনন্দের দিক এই উভয় দিকই সমান বিদ্যমান। এত বড় যে আশ্চর্য্য বিশ্ব তাহাকে প্রয়োজনের দিক হইতে দিব্য সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবা যায়; কারণ আলো, বাতাস, অগ্নি, জল প্রভৃতির সমস্তেরই বিচিত্র কার্য্য রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের ব্যবহার কি তাহা জানিয়া মনুষ্য-সভ্যতা এক পা এক পা করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্বজগতে আসিয়া অবধি মানুষ এই ব্যবহারের দিকটাকে সর্ব্বপ্রথমে ভাল করিয়া ধরিয়াছিল ও চিনিয়াছিল।

এখন যদিও মানুষ বিশ্বকে শরীরের প্রয়োজন সাধন করিবার মস্ত কারখানা বলিয়া মনে করে না, তথাপি তাহার সে দিকটা যে একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহাতো বলা চলে না। সকল শরীরেরই বৃহৎ বিস্তার

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের সভায় পঠিত।

এই বিশ্বশরীর, ইহাকে প্রতিনিয়ত খাইয়া তবে প্রাণ বাঁচিয়া আছে। নিশ্বাসের জন্যই এত বড় আকাশ, দৃষ্টির জন্য এত বড় সীমাহীন লোক লোকান্তর, শ্রুতির জন্য বায়ুপ্রবাহ, পুষ্টির জন্য অন্নজল। যিনি যত বড়ই কবি হোন্ শরীরের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় তাঁহার নাই।

কিন্তু এই বিশ্ব যে এত প্রয়োজনের, অথচ ইহার কোন জায়গায় তাহার লক্ষণ ধরা পড়িল না। সকল প্রয়োজনকে অন্তরাল করিয়া দিয়া ইহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য আপনার ভরপুর আনন্দে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এত বড় আকাশ দেখিয়া কি কাহারও মনে হয় যে, এ কেবল আমার নিশ্বাস লইবার জন্যই আছে? সুপক্ব শস্যক্ষেত্র দেখিয়া কৃষকের মনে অর্থলাভের যে চিন্তাই জাগুক্, তাহার রসনা কখনই লুব্ধ হইয়া উঠে না। সুবর্ণে হরিতে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত মণ্ডিত হইয়া যখন সুদূরবিস্তীর্ণ ধান্য-শীর্ষ বায়ুস্পর্শে কম্পিত হইতে থাকে, তখন জঠরানলের ক্ষুধা যতই থাক্, সে ক্ষুধাতো মাথা জাগাইয়া উঠে না। নদীর জলে পিপাসা মিটিলেও কেহ তাহাকে জলের কলসীর মত কেবলি পিপাসা মিটাইবার সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করে না। প্রয়োজন বাস্তবিক কতটুকু? সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও বর্ণে গন্ধে সঙ্গীতে রসে রূপে—আনন্দ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং কত অজস্র অপব্যয়ে আপনাকে পরিকীর্ণ করিতেছে। ইহার এত প্রয়োজন সাধন করিয়াও এত আনন্দ!

বাস্তবিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের অতীত আনন্দের এই যে মাখামাখি মিলন বিশ্বে দেখা যায়, ইহার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য মনে না আসিয়া পারে না। সেটি এই যে, অনন্ত আপনাকে অনন্ত করিয়া দান করিতেছেন। তাঁহার আনন্দকে কেহ বা পেট ভরাইবার শারীরিক অভাব মিটাইবার দিক্ হইতে ভোগ করিতেছে, কেহবা তাহার মধ্যে নানা নিয়মের ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ পাইতেছে, কেহবা তাহার উপরে একটি সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দকেই অন্যরূপে ভোগ করিতেছে, কেহবা তদপেক্ষা গভীরতর স্থানে সকল রসের অন্তরালে একটি অনির্ব্বচনীয় সত্তার সান্নিধ্য উপলব্ধিতে ভোগ করিতেছে। সীমা এইরূপে সীমার রেখাকে অসীমতার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই সমগ্রতার আনন্দটির কোথাও ব্যত্যয় ঘটে নাই।

এই প্রয়োজন যদিও বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ, তথাপি বিজ্ঞান প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকু পার হইয়া কোন্ রহস্যের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই। এক সময়ে মানুষ অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপারকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বলিয়া জানিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য কল্পনা করিয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল যে পদার্থ বাস্তবিক অনেক নাই, সমস্ত পৃথিবী এবং সৌরজগৎ কয়েকটি মূল পদার্থ দ্বারা গঠিত। বায়ুকে ইচ্ছামত তরল করা যায়, কঠিন করা যায় আবার কঠিনতম পদার্থকেও বায়ুতে পরিণত করা যায়। অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা সকল বস্তুই গঠিত এবং ঠিক মাপকরা পরিমাণে তাহাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়া থাকে। পদার্থ যেমন অনেক নাই, শক্তিও সেইরূপ অনেক নাই, যদি চ শক্তির রূপরূপান্তর অনেক। শক্তিকে বিনাশ করাও কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে। রসায়ন ও পদার্থতত্ত্বের এই সকল আবিষ্কারে এই একটি কথা গাঝাড়া দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, যে প্রকৃতির মধ্যে সমস্তই কেবল চলার মুখে আছে, একেবারে নিশ্চল স্থিতিশীলতা প্রকৃতির মধ্যে কোথাও নাই।

ইহার পর জীববিজ্ঞানে যখন অভিব্যক্তিবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেখানেও এই একই কথা আরও স্ফুটতর প্রত্যক্ষতররূপে প্রতিভাত হইল। দেখা গেল যে ক্রমাগত একই জীবকোষ আপনাকে কত বিচিত্র জীবদেহের মধ্য দিয়া পরিণত করিয়া আসিয়াছে—কত বা বিনষ্ট হইয়াছে কত বা টিঁকিয়া গিয়াছে। রূপ হইতে রূপান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে কেবলি যাত্রা—বিশ্বজগতে এই এক আশ্চর্য্য লীলা! এখানে একং রূপং বহুধা ভবতি—একরূপই নানা হইয়া উঠিতেছে।

মানুষের মনকে বিজ্ঞানের এই বিশ্বতত্ত্ব একটি অভাবনীয় রসে পূর্ণ না করিয়া পারে না। তাহাকেও অবশেষে সাহিত্যশিল্পকলার দিকে ঠিক এমনি করিয়া তাকাইয়া বলিতে হয়, যে এই তত্ত্ব যে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—সাহিত্যের মধ্যেও এই তত্ত্বেরই কারখানা। সেখানে মানুষের মানসজগতেও এই কাণ্ডটি চলিয়াছে--কেবলি রূপ হইতে রূপান্তরে যাত্রা, তাহার সীমা নাই, সংখ্যা নাই। বিশ্বজগতে নিয়ম যেমন সরল, কিন্তু বৈচিত্র্য অসংখ্য, তেমনি মানসজগতেও গুটিকতক ভাবমাত্র সম্বল, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। বিশ্বকে যে আমরা কাব্য বলিয়াছি, এ পর্য্যন্ত কোন্ পাঠক তাহার বৈচিত্র্যের শেষ পাইয়াছে, বা তাহার মধ্যে যে নিয়ম কাজ করিতেছে বলা যায়, তাহার কিনারা পাইয়াছে? নিয়মও নূতন নূতন বাহির হইতেছে, বৈচিত্র্যও নূতন নূতন দেখা দিতেছে। এক একজন বৈজ্ঞানিক এক একটা থিওরি খাড়া করিয়া মনে ভাবেন, এইবার বুঝি রহস্য ফাঁস হইয়া গেল, আর কিছুই বাকি রহিল না—কিন্তু আবার আর একজন আসিয়া নূতন সব

তথ্য হাজির করেন এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত মতের সঙ্গে তাহাদের সামঞ্জস্য করা আর চলে না। বাস্তবিক মূল বিশ্বতত্ত্ব লইয়া বাদানুবাদের অন্ত নাই—প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুই চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে না। মত কেবল মতান্তরকে অগ্রসর করিয়াই আনিতেছে।

এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, তাহা এই যে অনন্ত অনন্তরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই অপরূপ বিশ্বকাব্যটি নিয়তই সৃজ্যমান। তত্ত্ব যতই তাহাকে বাঁধিবার জন্য শৃঙ্খল লইয়া পিছনে পিছনে ছুটুক্—তাহার ছোটারও কোন দিন অন্ত হইবে না। রহস্যভবনের দরজা একটির পর একটি খুলিয়াই চলিবে, প্রতিবারই মনে হইবে এই বুঝি শেষ। কিন্তু শেষ যে বস্তুতঃই নাই সে কথাটা খুঁজিতে খুঁজিতেই জানা যাইবে। তবু এই খোঁজাতেই আনন্দ, কারণ খুঁজিয়া যে কিছু পাওয়া যাইতেছে না তাহা নহে। যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ।

সাহিত্য ও কলার সঙ্গে বিজ্ঞানের এই যোগের জায়গাটা বেশ দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভেদের জায়গাটা আরও বেশি স্পষ্ট। বিজ্ঞানকে তত্ত্ব বাহির করিতেই হইবে, সেই তাহার কাজ। শেষ তত্ত্ব অবশ্য মিলুক্ বা না মিলুক্। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পকলার সে বালাই নাই। তাহাদের মধ্যে কোন অন্বেষণ নাই, কেবল প্রাপ্তিরই কথা। সেই জন্য যদিচ বিজ্ঞানের মধ্যদিয়া বিশ্বজগতের অন্তহীন বৈচিত্র্যের একটা প্রকাণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই বৈচিত্র্যগুলিকে যে নিয়মসূত্রগুলি গাঁথিয়া রাখিতেছে, তাহাদিগকেও ধরিবার চেষ্টা করা যায়—কিন্তু বৈচিত্র্যের ভিতরকার আনন্দের কোন বার্ত্তা বিজ্ঞানে মেলে না। বিজ্ঞান এই বিশ্বকাব্যের অক্ষরগুলি জড়ো করে, এবং কি ছন্দে তাহারা বাঁধা তাহা আলোচনা করিয়া বাহির করে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত যে একটি বড়ভাব এই ছন্দে বন্ধে রূপেভাষায় আপনাকে অহরহ প্রকাশ করিতেছে, সেই ভাবটিকে বিজ্ঞান দেখিতেই পায় না। কেবল যেটুকু বাহিরের যেটুকু প্রতিভাত মাত্র, বিজ্ঞান তাহাকেই জানে, যাহা অন্তরের ও যাহা অব্যক্ত তাহার সম্বন্ধে সে উদাসীন। বিশ্বকাব্যের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই এক দ্বন্দ্ব-রেখা টানিয়া তাহাকে দুইদিক্ দিয়া আলোচনা করিতেছে।

বিজ্ঞানে সেই জন্য পদে পদে প্রমাণ-প্রয়োগের দরকার, কিন্তু সাহিত্যে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। সে আপনিই আপনার প্রমাণ।

আমরা সাহিত্যশিল্পকে একত্র করিয়া এতক্ষণ কথা বলিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আরও একটু বিশেষের মধ্যে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা আজ কবিতার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কবিতা যে সঙ্গীত বা চিত্রকলা বা আর কিছু হইতে মূলতঃ স্বতন্ত্র এমন আমরা মনে করিনা সে পূর্ব্বে "আর্ট" প্রবন্ধেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তবে প্রকাশের দিক্ দিয়া ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য অবশ্যই রহিয়াছে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার কোথায় ঐক্য আছে এবং কোথায় নাই তাহা দেখা গেল। আমরা বলিলাম যে বিশ্বসৃষ্টির ন্যায় কাব্যসৃষ্টিতেও ভাব আপনাকে কেবলি রূপ রূপান্তরে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। এই জন্য কবিতাকে জগৎময় সকল জিনিসের সঙ্গে সকল জিনিসের সাদৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতে হয়, কারণ সেই সাদৃশ্যের ভাষায় আপনার মনের সমস্ত ভাব তাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কবিদের নিকট হইতেই তো আমরা আমাদের ভাষা পাইয়াছি, তাই দেখ না কেন এমন অল্প কথাই আমরা বলি যাহা কোন না কোন জিনিসের সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে না। ইহার আর তো কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, কেবল ইহাই মনে হয় যে আমাদের মানস লোকের সঙ্গে বিশ্বলোকের একটা আশ্চর্য্য মিল আমরা এক জায়গায় আবিষ্কার করিয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের ভিতরে যাহা হইতেছে, বাহিরে তাহার অনুরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। বাহিরের সেই সকল দৃশ্যকে বস্তুকে ঘটনাকে যদি আমরা মনোভাবের সঙ্গে এক করিয়া গাঁথিতে পারি তবেই যেন বাহিরকে আমরা ঠিকমত ব্যবহার করি। নহিলে তাহার সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধ মাত্র রক্ষা করিয়া তাহাকে অত্যন্ত দূর করিয়া দেখা হয়। কিন্তু যখনি সে ক্রমাগতই ইঙ্গিত করে ইসারা জানায়—কত দৃশ্য গন্ধ শব্দ প্রেরণ করিয়া মনের ভাবকে স্ফুট আকারে প্রকাশ করিবার জন্য কত সাহায্যই করে,—তখনি তাহার দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহার পরম তাৎপর্য্যটি আমাদের কাছে সুগোচর হইয়া উঠে। বিশ্বকে তখন আমরা আর মন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেই পারি না। বিশ্ব যে মনেরই প্রতিরূপ সে কথাটা নিঃসংশয়ে বুঝি এবং তাহার সাহায্যে ভিতরের অস্পষ্ট ভাবগুলিকে বাহিরে আকার দান করিয়া বাঁচি।

কবিতার মধ্যে কোন্‌টা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া মনে কর? তাহার ভাব না তাহার প্রকাশ? আমি তো ভাবকে বড় স্থান দিতে রাজিই নই—কারণ ভাব আসলে অল্পই—তাহা একরকম আমাদের সকলের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। কবিতায় দর্শন

বিজ্ঞানের মত কোন আশ্চর্য্য তত্ত্ব কেহ প্রত্যাশা করে না। কারণ তত্ত্ব-নিরূপণ তাহার কাজ নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধান বিস্ময় তাহার প্রকাশ—কারণ সেই-খানে সে এমন করিয়া অত্যন্ত পরিচিত জিনিসকেও দেখায়, যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। সেই জন্য কবি-তার মধ্যে প্রধান সম্পদই তাহার উপমা। যিনি যত বড় জায়গায় ভাবকে ছাড়া দিতে পারেন, তিনি ততই বিস্ময় জাগান। শুধু তাই নয়। বিশ্বকেও তিনি ততই আপনার প্রকাশের সীমার মধ্যে টানিয়া আনেন। প্রকাশের এই যে একটি নবীনতা এবং প্রসার, আমিতো মনে করি কবিতার ইহাই প্রধান বিশেষত্ব।

বস্তুত এইখানে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে কবিতাসৃষ্টির ভারি একটি মিল আছে। আমরা দেখিলাম যে ক্রমাগত এক রূপ আপনাকে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে লইয়া যাইতেছে, বিশ্বজগতে এই এক কাণ্ড চলিয়াছে। কবিতাতেও মনের ভাবকে রূপ দান করিবার কার্য্যে এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রূপ দিলেই যে সে ফুরাইয়া গেল তাহা নহে, সে চলিতেই থাকিল। তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাকে রূপ দিতে যাই, সে জিনিসটি কি রহস্যময়! ধর আকাশের সৌন্দর্য্য। আমার মনে ইহা যে ভাবোদ্রেক করে, তাহাকে রূপ দিতে গেলেই আমি দেখি, যে আমি বলিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারি না। আমি যে উপমাই দিই তাহা যেন শত শত ভাবী উপমার মুখবন্ধ হইয়া থাকে মাত্র। সেই জন্যই তো কোন বস্তু কবিতার কাছে পুরাতন হইতে পারে না। তাহার সৃষ্টি যে থামে না। বিশ্বসৃষ্টির মত নব নব রূপে বিক-শিত হইয়া কালে কালে তাহা অগ্রসর হইতে থাকে।

আজ শরতের দুপর। অনেক দিন পরে আকাশ পরি-ষ্কার হইয়া গিয়া রোদ দেখা দিয়াছে। নীল আকাশ মেঘ-মুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দুটা একটা লঘু মেঘ রৌদ্রে শুভ্র হইয়া সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ আকাশের নীলিমা দেখিয়া বুকের ভিতরটা আনন্দে কেমন করিয়া উঠিতেছে। দূরে ধানের ক্ষেতের সবুজাভায় চোখ স্নিগ্ধ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই শরতের সৌন্দর্য্যটি কেমনতর? কালিদাস লিখিতেছেন :—

> ব্যোমকচ্ছিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈ
> স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশং প্রযাতৈঃ
> সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈ
> রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ।

জলশূন্য হওয়াতে মেঘ সকল রৌপ্য শঙ্খ ও মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও লঘুতর হইয়াছে। তদবস্থায় পবনবেগে শতদিকে পরিচালিত হইয়া প্রয়াণ করাতে আকাশমণ্ডল কোথাও উৎকৃষ্ট চামরসমূহে উপবীজিত রাজার ন্যায় সংলক্ষিত হইতেছে।

এই একটিমাত্র শ্লোকে আমার সমস্ত দুপুরের অব্যক্ত ভাবটি যাহা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছিল তাহা একটি রূপ লাভ করিল। আমি রক্ষা পাইলাম। আমি প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার ভাবের ঠিক্ রূপটি আমি দেখিলাম। কিন্তু এই উপমাটি কি চূড়ান্ত? আর কোন উপমা নাই? আর কোন কবি শরতের এই সৌন্দর্য্য কি দেখে নাই? এ যেমন একটি রূপ, তেমনি বিদেশের একজন কবি লিখিতেছেন :—

> "on a half reap'd furrow sound as leep
> Drowsed with the fume of poppies, while thy hook
> Spares the next swath and all its twined flowers"

অৰ্দ্ধকৰ্ত্তিত ক্ষেত্রের হলদীর্ণ গর্ত্তের মধ্যে শরৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছে, পপির ঘন গন্ধে তাহার নিদ্রাবেশটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে—তাহার নিড়ানী পার্শ্ববর্ত্তী তৃণ ও আগাছাগুলিকে এখনো উপড়াইয়া ফেলে নাই।

আবার বাংলাদেশের কবি লিখিতেছেন :—

> মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
> গন্ধে ভরিছে অবনী।
> জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
> শুভ্র যেন সে নবনী।

এমনি করিয়া দেখ তিনজনের কাছে শারদসৌন্দর্য্য তিন ভিন্ন রূপ বহন করিয়া আনিয়াছে। একজন তাহাকে রাজরূপে দেখিলেন, একজন নিদ্রিত কৃষকরূপে এবং একজন মাতৃরূপে। তিন রূপের মধ্যে কত বিভিন্নতা অথচ পাশাপাশি যখন পড়িতেছি, তখন আমাদের মন বলিতেছে, হাঁ তিনই সত্য। সত্যই শরতের একটা জম্‌কাল ভাব আছে যাহা রাজার সঙ্গেই তুলনীয়। ইহার মধ্যে একটা দূরের স্বপ্ন আছে, একটা মোহ আছে যাহার নিদ্রার সঙ্গেই মিল হয়। এবং ইহার মধ্যে একটি দান করিবার ভাব আছে যাহা মাতার অজস্র স্নেহ বিতরণেরই সমতুল্য। এমন আরও কত কবির কাছে কত রকমে এই শরৎ দেখা দিয়াছে তাহা কে জানে!

এখানে যদি জিজ্ঞাসা কর যে তবে কি কবিতার কোন বড় বিষয় নাই—তাহার মধ্যে কোন বড় ভাব নাই—সে কি শুধুই কতগুলি চিত্র বা উপমামাত্র? কত-গুলি ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাষার ছটা? আমি তাহার উত্তরে বলি যে তা কেন হইবে—তুমি যে কোন ভাবকেই কবিতায় ব্যক্ত করিতে পার আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, যে-সকল ভাবের মধ্যে একটি অনির্দ্দেশ্যতা এবং অনির্ব্বচনীয়তা আছে, কাব্যের

দরবারে তাহারাই ক্রমাগত বচন ও রূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে। যে সকল বিষয় একেবারে প্রমাণদ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট তাহারা কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জ্যামিতিকে তুমি হাজার ছন্দ করিয়া সুর করিয়া পড়িলেও তাহা কবিতা হইবে না—কারণ তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দিষ্টতা ও অনির্ব্বচনীয়তা নাই। কিন্তু আমাদের হৃদয়াবেগমাত্রেরই মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাকে ঠিক্‌মত বলিয়া উঠা শক্ত, শেষ করিয়া ফেলাও শক্ত। প্রেম বল, সৌন্দর্য্যবোধ বল, যে কোন অনুভূতি বল আমরা তাহাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। শুধু অনুভূতি কেন, আমাদের চিন্তা যখন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যুক্তির পোষাক আঁটিয়া না বেড়ায়, যখন সে রহস্যের নানা আভাস-ইঙ্গিত ধরিবার জন্য অনুভূতির সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয় তখন তাহাও কবিতার বিষয়ীভূত হয়। যেমন ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতা, বা এমার্সনের কবিতা। আমাদের দেশে যেমন কবীরের কবিতা। কারণ তখন সে রূপ প্রার্থনা করে, সে প্রকাশ চায়। প্রমাণের নাগবন্দী হইতে তাহার আর ইচ্ছা থাকে না, সে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত উড়িবার দুইটা বড় বড় পাখা চায়। ক্রমেই দেখা যায়, যে নূতন নূতন অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে এবং কাব্যে তাহারা প্রকাশ লাভ করিতেছে। তাই ভাবসম্বন্ধে বাচবিচার করা যায় না—কেবল এইটুকু বলা যায় যে তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা থাকা দরকার।

আমরা দেখিলাম যে উপমা কিম্বা চিত্রের দ্বারা ভাব আপনাকে ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনে এবং আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শুধু উপমায় বা চিত্রে কেন? সঙ্গীতেও ভাবকে রূপ দেওয়া যায়। ঐ শরতের যেমন চিত্র দেখিলাম তেমনি গানও তো আছে; যেমন ধর :—
Tears, idle tears, I know not what they mean
—টেনিসনের সেই গানটি—

Tears, idle tears, I know not what they mean
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the skies
In looking on the happy Autumn fields
And thinking of the days that are no more.

কিম্বা বাঙালী কবির :—

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া
দেখিনাই কভু দেখিনাই এমন তরণী বাওয়া!
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া
দেখিনাই কভু দেখিনাই এমন তরণী বাওয়া!

চিত্রেই দাও, গানেই দাও—ব্যক্ত করা লইয়া কথা। যদি পূর্ণভাবে তোমার ভাবটিকে বাহিরে ধরিতে পারিলে তবেই তাহা কবিতা হইল। যদি বাহিরে ধরিতে না পারিয়া কেবল কতগুলি শুষ্ক শব্দ ও সংস্কারগত কথার জাল তৈরি করিলে, যাহার মধ্যে কোন নূতনত্বের স্বাদ নাই তবেই কবিতা মাটী হইয়া গেল।

ঐ যে দুইটি গানের উল্লেখ করিলাম উহাদের মধ্যেও শরতের দূর স্বপ্নের এবং আলস্যজড়িত স্মৃতির ভাবটি কেমন জমিয়াছে দেখত। প্রথমটিতে কোন্ দূর স্মৃতির দিকে চাহিয়া কি একটি দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা এবং দ্বিতীয়টিতে কি একটি উদাস-করা সুদূরে চলিয়া যাইবার ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। শরতে এরূপ ভাব আমাদের সকলেরি মনে আসে যায় তাহাতে কি আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহাকে যদি ঠিকমত ধরিয়া রাখিতে পারি, হয় কোন উপমায় নয় কোন সুরে তবেই আমাদের তৃপ্তি হয়। তখন যাহা ভাসিয়া ভাসিয়া আবছায়ার মত বেড়াইতেছিল, তাহা একেবারে একটি রূপের মধ্যে আসিয়া ধরা দিল—বহু বাক্যব্যাকুলতার অবসান হইয়া গেল।

এই যে আবছায়া ভাবকে স্ফুট করিয়া তোলা এবং উপযুক্তরূপে ভাষায় বাহির করিয়া আনা, এ কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। আমি একটু পূর্ব্বে বলিলাম যে, ভাব আমাদের সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু আমরা "নীরব কবি।" অর্থাৎ কোন কবিই নই। কারণ আমরা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, প্রথমতঃ তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি না, তাহারা ছায়ার মত আসে এবং মিলায়, দ্বিতীয়তঃ যদি বা তাহারা কিয়ৎকাল মনের মধ্যে টিঁকিয়া থাকে, তাহাদিগকে কেমন করিয়া যে প্রকাশ করিব তাহা খুঁজিয়া পাই না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা নারীর সৌন্দর্য্য আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে,—আমরা এটা বুঝি যে তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে। কিন্তু তাহাকে কালিদাস মেঘদূতের একটি শ্লোকে যেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কি তাহা কখনো পারি?—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্‌ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

প্রিয়ঙ্গু লতাতে তোমার অঙ্গ, চকিত হরিণীর লোচনে তোমার দৃষ্টিপাত, শশধরে তোমার বদনচ্ছ্যতি, শিখিপুচ্ছে তোমার কেশ, অতিসূক্ষ্ম নদীতরঙ্গসমূহে তোমার ভ্রূবিলাস উৎপ্রেক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু হে কোপনে, কোন একটিমাত্র বস্তুতে তোমার সাদৃশ্য পাই না।

এই যে সকল বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যকে একটি মূর্ত্তির মধ্যে

পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, যাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একজায়গায় জড় করা—তেমনি আবার যে-সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিতে বদ্ধ হইয়া আছে তাহাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া সকল সুন্দর পদার্থের মধ্যে দেখা—আমার কাছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এতো সৌন্দর্য্যকে কোনমতেই স্থূল করিয়া দেখা নয়। যাহাকে মূর্ত্তি বলিয়া জানি, সে যে কত অশরীরী সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতে গঠিত—কত দুলতায়, কত বর্ণে, কত কিরণে, কত রেখার ভঙ্গিমায়, যে সেই সব সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে কত রকমে ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছি—মূর্ত্তির মধ্যে হঠাৎ সেই সকল স্মৃতি আসিয়া ভিড় করিয়া বসিতে সে মূর্ত্তি কি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে! মূর্ত্তিকে এমন ব্যাপ্ত করিয়া না দেখিলে ইন্দ্রিয়ের উপর তাহার নিষ্ঠুর আঘাত কি কোনমতে ঘুচে? তেমনি আবার, সেই সমস্ত আবছায়া অনুভূতি-রাশিকে যদি মূর্ত্তি না দেওয়া যায়, তবে কে তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? তাহারা উঠিবে এবং মিলাইবে।

কবি-মানুষটি যেমন এই অশরীরী ছায়াময় ভাবগুলিকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারেন, তেমনি সেগুলিকে পরিস্ফুট আকার দান করিয়া সকলের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ জাগ্রত করিতেও তিনি সমান পটু। কিন্তু এই অস্ফুট জিনিষকে ধরিতে পারা এবং স্ফুট করিয়া তুলিতে পারা কল্পনার কাজ। এই কল্পনার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে কখনই কবি হওয়া যায় না। কল্প না কথাটা আমাদের ভাষায় বড় খাটো এবং হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে fancy বলে আমরা অনেক সময় কল্পনাকে সেই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি! তাহার মানে অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বপ্নলোকের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো এবং কোন বস্তুগত সত্তাকে না ধরিতে পারাই যেন কল্পনা। অথচ কল্পনা ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজী imagination শব্দটা বরং কল্পনার যথার্থ অর্থ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। কল্পনার আলোকে সমস্ত অস্পষ্টভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে, যাহা স্মৃতির মধ্যে একসময়ে ছিল কিন্তু তারপর বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে তাহা জাগ্রত হয়, চতুর্দ্দিককার নানাপদার্থ আসিয়া সেই ভাব ও অনুভাবগুলিকে রূপদান করিতে থাকে, তাহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই যে একটি পরিস্ফুটন ক্রিয়া, ইহাই কল্পনার বিশেষ কাজ। সুতরাং যাহারা ইহাকে অলস স্বপ্নলীলা বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহারা কল্পনার যথার্থ অর্থই জানে না। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, কবিতা বল, সকল ক্ষেত্রেই কল্পনা ভিন্ন এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যাহা খণ্ড ব্যক্ত, যাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা হইতে, যাহা দূর ও অব্যক্ত, যাহা অতীন্দ্রিয় তাহার দিকে দৃষ্টিকে কে প্রসারিত করিবে? কল্পনা। প্রত্যেকটি খণ্ড পদার্থের ভিতরে যে সেই অব্যক্তের দুর্লক্ষ্যের নানা আভাস-ইঙ্গিত হীরকের নানা মুখ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে, সে তত্ত্বটি একমাত্র কল্পনারই জানা আছে। সুতরাং এই বিশেষ শক্তিটি না থাকিলে কবির কবিত্ব নিতান্ত অলস জল্পনা ও স্বপ্নের বিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহা কোন একটি গভীরতর সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র-স্থানে গিয়া পৌছায় না, তাহার মধ্যে কোন সত্যকে পাওয়া যায় না।

অথচ শুধুই যে কল্পনা খাটাইয়া কাব্য রচনা সম্ভব হয় এমন মনে করিলে ভুল হইবে। কবিতার মধ্যে একটা স্বতোচ্ছ্বসিত স্ফূর্ত্তি আছে, চেষ্টা করিয়া গড়িয়া পিটিয়া কবিতাসৃষ্টি সম্ভবেনা। এইজন্য আমরা বলিয়া থাকি যে বড় কবি মাত্রেই inspiration হইতে লেখেন, অর্থাৎ তাঁহারা ভিতর হইতে একটা প্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া লেখেন। কাব্যকে আপন ইচ্ছামত তৈরি করি-বার ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকে না। গ্রীকেরা ম্যুস অর্থাৎ কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের আরাধনা করিত, তাঁহাদের আবির্ভাব ভিন্ন যে কাব্য কিম্বা সঙ্গীত কিছুই সম্ভব হয় না, তাহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল। আমাদের দেশে বীণাপাণির স্তব না করিয়া ও তাঁহার প্রসাদ লাভ না করিয়া কেহ বাক্য পাইবার ভরসা রাখে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, যাহারা কিছু সৃষ্টি করে তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে—কোন দিন তাহাদের যেমন আপনিই ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, প্রকাশের আর কোন বাধা থাকে না, অন্যান্য দিনে তাহা হইবার জো নাই। এতো তর্কযুক্তির ব্যাপার নয়, এ একেবারে অভিজ্ঞতার কথা। যেদিন বিশেষ করিয়া কোন ভিতর হইতে প্রেরণা না জাগে, সেদিন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও একছত্র ভাল কবিতা বা তুলির দ্বারা একটা ভাল আঁচড় কাটিবার সাধ্য কি! এ ঠিক বসন্ত আর শীতের মত। শীতে সমস্ত অসাড়, নির্জীব—না আছে গাছপালার শ্যাম-লতা, না আছে পাখীর গান—না মিলে পুষ্পের সৌরভ—কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ একটু হাওয়ার বদল যেমনি অনুভব করা গেল, অমনি যাদুকরের মায়াযষ্টির স্পর্শে যেন, দেখিতে দেখিতে রাতারাতি জীর্ণ তরুতে কিশলয় মঞ্জরিত হইয়া উঠিল, সুদূর সমুদ্র হইতে পাড়ি দিয়া পাখীর দল আসিয়া কি অশ্রান্ত কলগান লাগাইয়া দিল, প্রাণ এবং পুলক আর ধরে না! শীতের দিনে বসন্তের এই আনন্দ-নিশ্বাসের এই অজস্রবিকীর্ণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের কথা কি কেহ মনে আনিতেও পারিত? ঠিক তেমনি, কোন্ দিন যে ঠিক সুরটি ঠিক রূপটি ঠিক ভাবাবেগটি পাওয়া যাইবে, তাহা যদি কবির আয়ত্তের মধ্যে থাকিত, তবে তাঁহার ভাবনা ছিল না। তবে তিনি

প্রত্যহই এমন কবিতা লিখিতেন, যাহার তুলনা মিলিত না। কিন্তু সমস্ত জীবন ভরিয়া সাধনা করিয়াও ক'টা কবিতা তিনি লিখিতে পারেন, যাহা অমর হইবে? সেইজন্য মানুষ নিজের উপর ভরসা না রাখিয়া ম্যুস বা বাগ্‌দেবীর উপর ভরসা স্থাপন করে—সে জানে যে ভিতর হইতে আর কেহ লেখায়। যে ব্যক্তি চিন্তাকরে কাজ করে, নানা বাজে গল্প করে—তাহার হাতে এমন মায়ামন্ত্র নাই যদ্দ্বারা সে অপরূপকে তাহার তুচ্ছ ভাষার মধ্যে আবির্ভূত করিতে পারে।

সেইজন্য মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তার অস্তিত্বকে মানা দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জীবনদেবতা নাম দিয়াছেন। যে-মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে কাজ করে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় সেই মানুষই যে ভাবসৃষ্টি করে তাহা নহে। কারণ দেখা গেল যে বিশেষ প্রেরণার বলে, সেই মানুষ একদিন আপনার রচনায় আপনি বিস্ময়বোধ করে, অথচ তাহারি অভাবে, অন্যদিন তাহার মত পঙ্গু ও শক্তিহীন যদি আর কেহ থাকে। ওয়ার্ডস্বার্থের সেই "serene and blessed mood" সেই শান্ত এবং কৃতার্থ মানস অবস্থা যখন "we are laid asleep in body and become a living soul" আমাদের শরীরসম্বন্ধে আমরা নিদ্রিত থাকি এবং জাগ্রত জীবন্ত আত্মা হইয়া উঠি—সেই অবস্থায় লিখিত কবিতাগুলি পাঠ কর এবং Ecclesiastical sonnets নামক চতুর্দ্দশপদীগুলিও পাঠ কর—প্রেরণার বল এবং প্রেরণার দৈন্যে কবিতার যে কি প্রভেদ হয় এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিবে। এ যেন দুজন স্বতন্ত্র মানুষের রচনা।

'জীবন-দেবতা'সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে আবার সে আলোচনা উত্থাপন করিলে অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আমি এইটুকু বলিতে চাই যে মানুষের মধ্যে এই যে দ্বৈত সত্তা আছে তাহা ক্রমশই মনস্তত্ত্বশাস্ত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে দেখিতেছি। আমাদের সচেতন ক্রিয়াশীল সত্তাকেই আমরা ভালরূপে জানি, কিন্তু তাহার নীচে যে বৃহৎ অর্দ্ধচেতন সুপ্ত সত্তাটি আছে তাহার সংবাদে আমাদের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহারা সৃজন করিতে চায় তাহাদের খুবই প্রয়োজন হয়। কেন না সেই সুপ্ত সত্তার মধ্যে আমাদের সমস্ত জীবনের সঞ্চয়, এমন কি আমাদের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চয়ও হয়ত জমিয়া আছে। আমাদের সচেতন সক্রিয় সত্তা ইহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ।

এই বুদ্ধির ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ সচেতন সত্তাটিকে কিয়ৎপরিমাণে আড়াল করিয়া না দিলে, কোন বড় কাব্য সৃষ্টি হই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তখনই "we are laid asleep in body and become a living soul", এবং তখনই "we see into the life of things"। তখন সৃষ্টির মধ্যে এমন একটা অপরূপত্ব ও অভাবনীয়তা দেখা দেয় যাহার জন্য আমরা কখনই প্রস্তুত ছিলাম না।

এইবার কবিতার ভাষা ও ছন্দ—তাহার বাহ্যকাঠামো সম্বন্ধে কথা বলিয়া আজিকার মত বিদায় লইব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিতায় ভাবের চেয়ে তাহার প্রকাশের মূল্য অধিক। ভাবমাত্রেই পুরাতন, কিন্তু কত নব নব কবির হাতে পড়িয়া তাহা চির নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই নব নব রূপ দানের শক্তিই কবিত্ব। প্রতিভাকে এইজন্য বলিয়াছে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। যে বুদ্ধি শুধু বিচারবিতর্ক করে, যে আপনার বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া যায়, সে প্রতিভা নয়। যে বুদ্ধি নব নব উন্মেষ লাভ করে তাহাই যথার্থ প্রতিভা।

সুতরাং ভাষা ও ছন্দ দিয়াই কবিত্বের বিচার করা সম্ভব। কেননা তাহাই তাহার রূপ। কিন্তু তাই বলিয়া কি শুধু ছন্দ ও ভাষার ঝঙ্কার ও ছটাকেই কবিত্ব বলিব? এ ভুল বুঝা অন্যায় হইবে। যে-রূপ কোন ভাবের রূপ নয়—সে তো প্রাণহীন দেহের মত। দেহটাকে তো কেহ মর্য্যাদা দেয় না, তাহার মর্য্যাদা প্রাণেরই জন্য। ভাব না থাকিলে রূপ কিসের? পক্ষান্তরে আবার যদি শুধু ভাব হইত, তবে সে দেহহীন প্রাণের মতই হইত—সে ছায়া হইত। সেইজন্য কোন কবির কাব্য আলোচনা কালে আমাদিগকে গোড়ায় দেখিতে হইবে যে, কবির ভাবটা কি, কি ভাব তিনি ব্যক্ত করিবার প্রয়াসী হইতেছেন। দ্বিতীয় নম্বরে দেখিতে হইবে, যে সেই ভাব কি রকম রূপ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ সে বেশ প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণ একটি বস্তুগত জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে—না, শুধু একটা সংস্কার, একটা বাক্য মাত্র হইয়া আছে।

যেমন ধর এই বিশ্বপ্রকৃতি। ইহার ভিতরে যে তত্ত্বই বাহির কর, যে ভাবই দেখ—ইহা একেবারে প্রত্যক্ষ—রূপরসে শব্দে গন্ধে পরিপূর্ণ—কিছুমাত্র কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে কি অতীন্দ্রিয় সত্তা নাই, অতলস্পর্শ গভীরতা নাই? এত আছে যে নিউটনের মত বড় বৈজ্ঞানিককে বলিতে হইয়াছিল যে, আমি রহস্যসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া গুটিকতক উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র—আমার সম্মুখে অনন্ত অগাধ সমুদ্র! কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এত গভীর হইয়া ইহা এই গোটাকতক ইন্দ্রিয়ের কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছে!

কবিতাতেও এই চেষ্টাটি রহিয়াছে—যদিচ বিশ্ব-

কবিতার মত এমন পরিপূর্ণ কৃতকার্য্যতা তাহাতে ঘটে নাই। তাহাকে ভিতরের জিনিস বাহিরের করিয়া দেখাইতে হয়। অথচ ভাষার মধ্য দিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে—যে-ভাষার সঙ্গে ভিতরের যোগ খুব নিবিড় ও একান্ত হইতেই পারে না। কারণ সে মানুষের প্রয়োজনের জন্যই সৃষ্ট। তাহার সকল অর্থই সীমাবদ্ধ।

ভাষাতে এই জন্য বর্ণ বা সঙ্গীত না সঞ্চর করিতে পারিলে কবিতা হয় না। বিশেষতঃ সঙ্গীতের একটা সুবিধা এই যে তাহাকে কোন অর্থের দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার আবেগ অনির্দ্দেশ্যতার অনির্ব্বচনীয়তার আবেগ। সঙ্গীত যখন ভাষার মধ্যে ছিদ্র করিয়া বংশীধ্বনি জুড়িয়া দেয়, তখন ভাষা দেখিতে দেখিতে অপরূপ মহিমায় ও লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন তাহার বাধা ঘুচিয়া গিয়া সে এক নিমেষের মধ্যেই ভিতরের ভাবকে বাহিরে বহন করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

এই সঙ্গীতের ও চিত্রের সম্পদ্ যে লেখকের যথেষ্ট নাই, তাঁহার ভাব ও কল্পনা যত বড়ই হোক—চিরন্তন কালে কবির আসন পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তিনি কোন দিনই মনে পোষণ করিতে পারেন না। কারণ তিনি অনির্ব্বচনীয় ভাবকে বাহির করিবেন কি উপায়ে? তিনি ভাষার কঠোর বাধাকে নরম করিবেনই বা কি উপায়ে?

আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে কবি বলিয়াছে। তাঁহার আনন্দ হইতেই সমস্ত জন্মলাভ করিতেছে, আনন্দে জীবিত থাকিতেছে এবং আনন্দেই বিলীন হইতেছে। এই আনন্দই তাঁহার বিশ্বকাব্যের প্রেরণা, ইহা হইতেই তিনি অপরূপ ও অব্যক্ত হইয়াও বিচিত্ররূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার আনন্দেরও যেমন শেষ নাই, তাঁহার ব্যক্তিরও সেইরূপ শেষ হইতে পারে না। তাঁহার এই সৃষ্টির মহাপ্রেরণার ছায়ার ছায়া লাভ করিয়া মানবকবি সামান্য উপকরণে সৃষ্টি করিতে বসিয়া যান। কিন্তু এই বিশ্বকাব্যের অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডতা আমরা কোন মানবকবির রচনায় বৃথাই আশা করিব। প্রথমতঃ দেখ তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের ভাব এবং উদার অসীম আনন্দ এ দুইই পাশাপাশি গাঁথা। তারপরে দেখ, তাহার মধ্যে এক আপনাকে নানারূপে ক্রমাগত অভিব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে, রূপেরও শেষ নাই এবং যে নিয়মে এই বিচিত্রতা বিধৃত তাহারও শেষ পাই না। অথচ এই চিরন্তন অন্বেষণ ও ব্যর্থ মনোরথের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ আনন্দ ও রসানুভূতি, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি একেবারে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় এই আদর্শভূত মহাকাব্যে সীমা এবং অসীমতা উভয়ে মিলিতভাবে অবস্থান করিতেছে—সীমা ক্রমাগত আপনার বৈচিত্র্যের রেখা টানিয়া অসীমতায় গিয়া হারাইয়া যাইতেছে এবং অসীমতার ভাবসকল সীমার ভিতরে ভিতরে আপনাকে অনির্ব্বচনীয় অপরূপ রূপে প্রকাশ করিয়া করিয়া কূল পাইতেছে না।

মানুষের কাব্যে আমরা এই অনন্ত পরিপূর্ণতার একটি আভাস মাত্র দেখিতে পাই। সেখানেও প্রথম জিজ্ঞাস্য, কবির কাব্যের প্রেরণাটা কোথায়? কোন্ ভাব তাঁহার মধ্যে বাণী লাভ করিবার উপক্রম করিতেছে? তারপরে জিজ্ঞাস্য, সে ভাব তাঁহার মধ্যে নব নব রূপ লাভ করিয়াছে কিনা, বিচিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে কিনা? সর্ব্বশেষ জিজ্ঞাস্য যে সেই রূপ কি সম্পূর্ণরূপে সুনির্দ্দিষ্টতার সীমায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, না তাহার মধ্যে, একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা নানা দিক দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই রূপের মধ্য দিয়া অরূপের কোন ছায়াভাস জাগিতেছে কি না। এতগুলা প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলে তবে কোন কবিতা সফলতার পাসমার্কা পাইয়া যায়। চিরন্তন কালের মধ্যে যে তাহার স্থান ধ্রুব হইয়া রহিয়া গেল, এ সম্বন্ধে আর সন্দেহের কোন স্থান থাকে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ভক্তবাণী।

(আমিয়েল)

আমাদের জীবনই বল, আর জীবনের সুখই বল, এই উভয়ই অপরের দান; যে ভাবে আমরা এই দান গ্রহণ করি, তাহাই কেবলমাত্র আমাদিগের নিজস্ব। আমরা যেন বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিরুদ্বেগে এ দান গ্রহণ করিতে পারি! আমরা যেন পরমদেবতার হস্ত হইতে এমন কি আমাদের আপন আপন স্বভাবও বিনম্র হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বুদ্ধি, দৃঢ়তা এবং প্রীতির সহিত চালনা করিতে পারি। আপন স্বভাবের কলুষ এবং বিকার যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এমন নয়, এই বিকার এবং কলুষ সত্ত্বেও আমাদিগের আপন অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পবিত্র আনন্দ হইতে কখনও; যেন বিমুখ না হই। জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন তাহাই সুমঙ্গল, আপনার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও, নিজের সুখচেষ্টাও তাঁহাকে উৎসর্গ কর, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন, বৈরাগ্য এবং স্বার্থত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ কর, তাঁহার আনন্দ এবং প্রীতির মহামন্ত্র শিক্ষা কর, হৃদয়কে

আনন্দের অভয় ইষ্টমন্ত্র জপ করাও। সেই পরমপিতাকে আনন্দস্বরূপ জানিয়া তাঁহার অজস্র দান প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে গ্রহণ কর। সুখী হইবার জন্য সাহস সঞ্চয় কর, মুক্তকণ্ঠে আপনার সুখ স্বীকার কর, আপনাকে সুখের আধার বলিয়া জানিও কিন্তু সাবধান, আপনাকে সে সুখের কারণ বলিয়া ভ্রান্ত হইও না।

আমাদের এই মানবজীবন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-ইতিহাসের খণ্ড সংক্ষিপ্ত অংশ, দিব্যবুদ্ধি এবং আত্মগরিমায় মহিমান্বিত। ইহার গঠন এবং পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের অন্তরের অন্তর প্রাণের প্রাণ নিরন্তর জাগ্রত। বিশ্বকাব্যের চঃণিকা এই দুর্লভ মানবজীবন; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সুন্দরতর আর কিছুই কখনো রচিত হয় নাই। মানব নাম সার্থক কর, সফল হোক তোমার প্রকৃতি, সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হোক তোমার ক্ষীণ দরিদ্র আত্মা, বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্ত্তি হও; নিখিল বিশ্বজীবনে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম, উন্নততম, মহত্তম, অসীম উদ্যোগ এবং অন্তহীন চৈতন্যের আধার হও। অপরিসীম অখণ্ড অনন্তের প্রতিকৃতিরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে সতত সচেষ্ট হও। তোমাতে সেই সর্ব্বময়ের প্রকাশ জাজ্জল্যমান ও পরিস্ফুট হউক—আত্মবিলোপ কর। অপার সমীরণ যেমন অবারিত অনিবার্য্য প্লাবনে শূন্য আকাশ মহানন্দে এবং অনন্ত জীবনে পরিপূর্ণ করিয়া আছে, তেমনি তোমার অস্তিত্ব সেই বিশ্বেশ্বরের ভূমানন্দে অনুপ্রাণিত হউক। জীবনের শূন্য পাত্র তাঁহার দিব্য অমৃতরসোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। নম্র হও হে ভক্ত, নিঃশব্দে একান্তে মৌন হইয়া থাক। অন্তরের গভীর নিভৃতে তাঁহার অপার্থিব রমণীয় দিব্যবাণী ধ্বনিত হউক। আপনার আত্মাকে সর্ব্বকলুষমুক্ত সুপবিত্র কর তবেই সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধের সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। আত্মার মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া নিভৃততম পুণ্যতম দেববেদিকার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব পরমাণুতে পরিণত কর তবেই দেশ কাল বস্তু প্রলোভন এবং আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারিবে, তবেই দেহভার এবং জীবনতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। জীবনের প্রতিদিনে মৃত্যুর দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করিয়া লও তবেই সেই চরম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি নির্ভয় প্রশান্ত হৃদয়ে অন্ধতা, বধিরতা, ব্যাধি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে পারেন, নিঃশঙ্কচিত্তে কঠোর ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডায়মান হইতে পারেন কেবলমাত্র তিনিই আপনাকে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন! হা আমি এখনও কত দুর্ব্বল, এ দুর্লভ বৈরাগ্য হইতে এখনও কত সুদূরে! যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব অন্ততঃ সেই সকল ক্ষণিক বস্তু হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা সন্তর্পণে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা অক্ষয় যাহা চিরন্তন; হে দীন, একান্তভাবে তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে চেষ্টা কর। জগদীশ্বরকে স্নেহময় মঙ্গলময় পিতা বলিয়া জান, তিনিই শিক্ষাদাতা, তিনিই দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা; পিতার ন্যায় তাঁহার স্নেহের শাসন, মঙ্গলবিধানের নিমিত্তই তাঁহার দণ্ড প্রচারিত হয় এই বিশ্বাসে হৃদয় দৃঢ় কর তবেই সাহস, সান্ত্বনা এবং অভয় প্রাপ্ত হইবে।

বিশ্বসম্রাটের সন্তান রাজকীয় শক্তির অধিকারী অবিনাশী আমরা, তবুও স্নেহ, প্রেম, করুণা, সহানুভূতি ভিন্ন আমাদের জীবন কত শূন্য কত দরিদ্র হইয়া পড়ে। পদে পদে আমাদের পতনের কত ভয়! আমরা যেমন ভাবে ঈশ্বরের পরম প্রকাশ কিম্বা মানব-আত্মার চরম বিকাশ আমাদের জীবনে দেখাইতে পারি তেমনি ভাবে আমরা কখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় প্রবল প্রচণ্ড শক্তির আধার, আবার কখনো ধূলিশায়ী কীটের ন্যায় ক্ষীণ, অপারগ ও অক্ষম! সেই অনন্তশক্তির সহায়ে আমরা অজেয় আবার তাঁহারি বিচ্ছেদে আমরা নিতান্ত দীন, একান্ত দুর্ব্বল!

যে ধর্ম্ম জীবন্ত জাগ্রত, কর্ম্মে এবং সাধনায় সম্পূর্ণ, আধ্যাত্মিকতায় সুগভীর রহস্যপূর্ণ সেই ধর্ম্মই মানবজীবনে মহিমা গৌরব এবং উৎসাহ আনয়ন করে। ধর্ম্ম আমাদিগকে অক্ষত অজেয় করিয়া রাখে। স্বর্গের নামেই আমরা পৃথিবীকে পরাভব করিতে সক্ষম হই। যে ব্যক্তি সৎপথের পথিক, পুণ্যের ভিখারী, পরমদাতা তাহাকে পুণ্য দান করিয়া উপরন্তু বহুবিধ সুখসন্তোষের বিধান করেন! স্বার্থত্যাগই বলসঞ্চয়ের প্রধান উপায়। ঐহিক মোহে যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত মুগ্ধ নহে ইহলোক তাহার পদানত। কেননা বস্তু অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠতর, পরমাত্মাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। অপার্থিব কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, সন্তোষ অর্জ্জন কর, আনন্দে পরিপূর্ণ হও তবেই বিশ্ববিজয়ী হইবে। হে প্রভু, পুণ্যপ্রয়াণী ধর্ম্মযাত্রীর সহায় হও, দুর্ব্বল তাহার দেহ, প্রলুব্ধ তাহার ইন্দ্রিয়সকল কিন্তু আত্মা তাহার কেবলমাত্র তোমাকেই কামনা করে, তোমারি পরমামৃত রসাস্বাদনের জন্য লোলুপ।

স্নেহের সহিত স্বায়ত্তশাসন, ইহাই শিশুদিগের উপর প্রভাব-বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়। সন্তান যেন আমাদিগের কোন অসংযমের অনুসন্ধান না পায়, কোন দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করিয়া তাহার সুবিধা লইতে সাহসী না হয়।

তাহার মনে দিনে দিনে এই বিশ্বাস যেন দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে সে আমাদিগকে কোন প্রকারে প্রতারিত কিম্বা প্রলুব্ধ করিতে নিতান্ত অক্ষম, তবেই স্বভাবতঃ ক্রমে সে আমাদিগকে শ্রদ্ধাস্পদ এবং সম্মানের পাত্র বলিয়া জানিবে এবং তাহার নিকট আমাদিগের আদর ক্রমে মূল্যবান হইয়া উঠিবে। সন্তান যদি আমাদিগের মনে ক্রোধ, অধৈর্য্য এবং উত্তেজনার সঞ্চার করিতে পারে তবে সে আপনাকে প্রবলপক্ষ বলিয়া জানে, কাজেই তাহার নিকট আমাদিগের সম্মানের দাবী হ্রাস হইয়া যায়, কেননা শিশুবুদ্ধি কেবলমাত্র বলকেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মাতা যদি শিশুজীবনের নিশ্চল ধ্রুব নিরন্তর সমুজ্জ্বল আলোক সূর্য্যস্বরূপ হয়েন, যেখানে সেই দুর্ব্বল, সুকুমার, চঞ্চল ক্ষুদ্র প্রাণীটি তাহার হৃদয়-আকাশের হাস্য ক্রন্দন, আলোক ছায়া, মান অভিমান-উচ্ছ্বাস, নিয়ত পরিবর্ত্তন একই চিরস্থির আলোকপ্রবাহে উদ্ভাসিত হইতে দেখে, যেখান হইতে সে উত্তাপ, জীবনী-শক্তি, বৈদ্যুতিক উৎসাহ এবং প্রশান্ত নির্ভীক হৃদয়বল সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে, তবেই উভয়ের সম্বন্ধ-সংযোগ সার্থক হয়। শিশুর জীবনে তাহার জননী সাধুতা, দৈব-শক্তি এবং ন্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ! অসীম শক্তি ও অনন্ত করুণার আধার, পরম ঈশ্বরের সীমাময় সন্নিকট পার্থিব প্রতিনিধি! যদি তিনি স্বয়ং অসংযত হয়েন তবে তাঁহার সন্তানের মনে ঈশ্বরসম্বন্ধে এক অব্যবহিত-চিত্ত অত্যাচারী রাজার ধারণা বদ্ধমূল হইবে, অথবা সে ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকৃতি বহুদেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে। পিতামাতার কার্য্যের আদর্শে সন্তানগণ শৈশবে যে পরিমাণে স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস গঠন করিয়া তোলে তাঁহাদিগের বাক্যে কিম্বা উপদেশে তাদৃশ ফল হয় না। তাঁহাদিগের আত্মা যে অপ্রত্যক্ষ আত্মার অনুগমন করে সন্তানের জীবনে তাহারি আদর্শ কার্য্য করিয়া থাকে তাঁহাদিগের বাক্য, পরামর্শ, উপদেশ, আদর, উচ্ছ্বাস, সম্বর্দ্ধনা বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণের ন্যায় আকস্মিক,—শিশুদিগের মনে ক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করে মাত্র কিন্তু পিতামাতা যথার্থ কোন্ দেবতার উপাসক নিপুণ জন্মসংস্কারের দ্বারা তাহারা সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৌদ্ধসাধনা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বৌদ্ধ সাধনার গোড়াকার কথা অবিদ্যার সহিত সংগ্রাম। বোধিদ্রুমতলে মহাপুরুষ বুদ্ধ যে দিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন, সেদিন মানবজীবনের কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল? তিনি তাঁহার নবলব্ধ প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা দেখিলেন—"অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম লাভ হয়।" এই জন্ম হইতেই মানব রোগ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু ও দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।'

মানবের এই মহদ্দুঃখের অস্তিত্ব, ইহার উৎপত্তির কারণ এবং নিবৃত্তির উপায়-নির্দ্ধারণেই মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। অবিদ্যাকেই তিনি মূলব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অবিদ্যার বিনাশ হইলেই ইহ-জীবনেই মানব নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধদেব ধম্মপদে বলিয়াছেন—"অবিজ্জা পরমং মলং"; তিনি সাধককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্‌খবো।" হে ভিক্ষুগণ, এই মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হও। এই অবিদ্যার বিনাশের জন্যই তিনি অষ্ট আর্য্য মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই সহিত সংগ্রামের জন্য সাধক মৈত্রী করুণা ও মুদিত ভাবনা অবলম্বন করেন; এই জন্যই তিনি মানব-জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ এবং সমগ্র প্রাণীর মূল ঐক্য চিন্তা করিয়া থাকেন। শীল-গ্রহণেরও তাৎপর্য্য ঐ নিকৃষ্টতম মলিনতা—অবিদ্যার বিনাশ।

অংশতঃ এই অবিদ্যাকেই পরাভূত করিয়া সাধক যখন সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও পাপ-প্রলোভনের নানামূর্ত্তি ধরিয়া এই অবিদ্যাই তাঁহাকে নানা দিক হইতে আক্রমণ করিয়া থাকে। সাধক জানেন, অবিদ্যা তাঁহাকে বিশ্ব-হইতে বিমুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র "অহং" এর সংকীর্ণ প্রাচীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিয়াছে; মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় তিনি তাঁহার আপনার সেই বৃহৎ সত্তা অনুভব করেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সত্তাকেই সত্য বলিয়া মনে করেন। অবিদ্যার বশে প্রবর্ত্তকের মনে এই সময়ে কখনো কখনো স্বীয় অবলম্বিত আর্য্যমার্গের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; আবার কখনো সদ্ধর্ম্ম ও শুভ প্রচেষ্টার উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। এই সংশয়-দোদুল্যমান চিত্ত লইয়াই তাঁহাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি অনলস হইয়া—

"অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপাচিত্তং নিবারয়ে"—

মনের পাপ ধুইয়া মুছিয়া কল্যাণের দিকে প্রাণপণে ধাবিত হইতে থাকেন। তাঁহার শুভ উদ্যম এবং

তাঁহার দৃঢ়তা একটি পর একটির করিয়া সংশয়-গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে থাকে। তাঁহার সাধনপথে বাধার অন্ত নাই; ভোগলালসা, ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখেচ্ছা ও অহংকার তাঁহার সম্মুখে সুদৃঢ় প্রাচীর-রূপে উপস্থিত হয়। তিনি শীলপালনে ও ধর্ম্মপ্রচেষ্টায় অবিচলিত থাকিয়া ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। দিনের পর দিন তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রভাবে ক্রমশঃ বাধাগুলি ভূমিসাৎ হইতে থাকে। প্রতিদিন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সাধু বৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণের চেষ্টা করেন, নবনব সদ্গুণ অর্জ্জনের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। তিনি আপনার ভিতরে আপনি জাগরিত থাকিয়া অভ্যন্ত পাপগুলি প্রক্ষালন করিয়া ক্রমশঃ নির্ম্মলতর হইতে থাকেন, এবং নিজের মনকে সাধু চিন্তাদ্বারা আবৃত করিয়া পাপের আক্রমণ-পথে নিত্য-নিয়ত বাধা প্রদান করেন।

এইরূপ কঠোর সংগ্রামের মধ্যদিয়া বৌদ্ধ সাধক যে অবিদ্যাকে আংশিক পরাস্ত করিয়া সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে সেই অবিদ্যার মূলোৎপাটন করিয়া বোধিলাভ করেন। এই সময়ে সাধক আপনার ক্ষুদ্র সত্তা বিশ্বসত্তার সহিত মিলাইয়া দিয়া আপনার সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পান।

এই যে সাধনপ্রণালীর কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে এক হিসাবে কোনো নূতনত্বই নাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ খণ্ডভাবে প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সাধনায় যেমন কঠোর তপশ্চর্য্যা নিষ্ফল বলিয়া উক্ত হইল; সংযম-বন্ধনমুক্ত ভোগবিলাসও তেমনি নিন্দিত হইল। বৌদ্ধসাধন-প্রণালী প্রেমহীন শুষ্কজ্ঞান নহে; অথবা জ্ঞানহীন বিকৃত প্রেম বা ভাবোন্মাদ নহে। বৌদ্ধ সাধনা যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্য; জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায়—যাহা কিছু অকল্যাণ তাহার বর্জ্জন, যাহা কিছু মঙ্গল তাহার গ্রহণ, এবং মনকে সর্ব্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া সর্ব্বত্র ইহার পরিব্যাপ্তি; ইহাই বৌদ্ধ সাধনা।

বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি সুদৃঢ় কিনা পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের শীল ও মৈত্রী মানবহৃদয়ে চির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জ্ঞানরূপে এই ধর্ম্মের তত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে যে ভাবে বিরাজ করিয়া থাকে, করুক; এই ধর্ম্মের যে অংশ সমগ্র মানবজাতির এবং সমস্ত জীবের সেবায় ও কল্যাণ-সাধনে প্রেমের মঙ্গলমূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার মনোহারিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধ সাধু জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আতপক্লিষ্টকে পাদপচ্ছায়া, তৃষিত পান্থকে পথের মধ্যস্থলে জলাশয় ও বিশ্রাম-ভবন, অসহায় রোগীকে সেবালয় এবং রোগার্ত্ত জীবকে চিকিৎসালয় দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধুদের অসামান্য স্বার্থত্যাগ, সংযম, দয়া ও প্রেমের দৃষ্টান্ত পাঠকমাত্রেরই চিত্ত বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করে, সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ সাধকের চরম লাভ নির্ব্বাণ। যে সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার লক্ষ্যে উপনীত হন, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয়, নির্ব্বাণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও বিশুদ্ধ প্রেমেরই চরম পরিণতি; ইহা নাস্তিবাচক শূন্যতা নহে। এই সাধনার নির্ব্বাণ, সমস্ত কুপ্রবৃত্তির নির্ব্বাণ—ক্ষুদ্র আমিত্বের নির্ব্বাণ—হিংসা-দ্বেষ-প্রভৃতি পাপলালসার প্রদীপ্ত শিখার চিরনির্ব্বাণ। আর এক দিক হইতে বলা যায়, নির্ব্বাণ—পাপপ্রবৃত্তির নির্ব্বাণ, প্রেমের নহে—ক্ষুদ্র সত্তার নির্ব্বাণ, বৃহৎ সত্তার নহে—অকল্যাণের নির্ব্বাণ, কল্যাণের নহে।

নির্ব্বাণকে দার্শনিকগণ নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য নানা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। নির্ব্বাণ যদি বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতা হয়, তাহা হইলেও ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পরম পদার্থ। সেই শূন্যতা "নাস্তি" নহে; তাহা "অস্তি" "নাস্তি" দুয়েরই অতীত, তাহা বাক্য মনের অনধিগম্য, তাহা অক্ষর, অপ্রমেয় ও গম্ভীর। এই শূন্যতাকে যদি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, বিশ্বসত্তা, পূর্ণতা, Everlasting yea বা এই শ্রেণীর অন্য কোনো একটা নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে গুরুতর ভ্রম হয় বলিয়া মনে হয় না। যে শূন্যতা একেবারেই নাস্তি তাহা এমন কিছু লোভনীয় নহে যে ইহারই জন্য সাধক প্রাণপণ সংগ্রাম করিবেন। জ্ঞানমূলক "নেতির" দ্বারা বৌদ্ধসাধক আপনার ছোট অহংকে সংকুচিত করেন; তিনি "উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুক।"—আসক্ত মনুষ্যদের মাঝখানে অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন; তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা—"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরমা দুখা" লোভকে পরম রোগ এবং সংস্কারকে পরম দুঃখ জানিয়া পরম সুখ নির্ব্বাণ লাভ করেন। আর একদিক দিয়া তিনি তাঁহার অন্তর সত্তাকে মৈত্রীভাবনাদ্বারা ভূলোকে দ্যুলোকে স্বর্লোকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া থাকেন। বৌদ্ধসাধনা যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে এই দুইটি দিকই ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

অন্তিম শয্যায় মহাপুরুষ বুদ্ধ এই সাধনার যে প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে তাহা বর্ণিত আছে। ইহাতে তিনি চারিটি ধ্যান, চারিটি ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা চারিটি ঋদ্ধিপাদ, পাঁচটি নৈতিক বল, সাতটি বোধ ও

আটটি পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই সাধনা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমেরই সাধনা। উরগবগ্‌গে মেত্তাসুত্তে সাধকের মৈত্রী ও কল্যাণ ভাবনার যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা অতীব চিত্তস্পর্শী। তথায় বলা হইয়াছে যে সাধক শান্তিপদ নির্ব্বাণ লাভ করিতে চাহেন; তিনি কর্ত্তব্যপালনে কুশল, সরল, বিনীত ও নিরভিমান হইবেন। তাঁহার অভাব অল্পই থাকিবে, অল্পেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার কোনো দুর্ভাবনার হেতু থাকিবে না, তিনি জিতেন্দ্রিয়, সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ ও অনাসক্ত হইবেন। তিনি ক্ষুদ্র পাপও আচরণ করিবেন না, তিনি ভাবিবেন সকল জীব সুখী ও নিরাপদ্ হউক। তিনি ভাবিবেন, সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, দৃষ্ট অদৃষ্ট, দূরবর্ত্তী সমীপবর্ত্তী, ভূতকালের ভবিষ্যৎকালের সকল প্রাণী সুখী হউক। তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করিবেন না, কাহাকেও ঘৃণা করিবেন না, অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও অহিত চিন্তা করিবেন না। জননী যেমন নিজের আয়ু দ্বারা একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, তিনিও তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রীতি রক্ষা করিবেন। জগতের উর্দ্ধে নিম্নে চতুর্দ্দিকে তিনি তাঁহার হিংসাশূন্য বৈরশূন্য বাধাশূন্য অপরিমেয় প্রীতি ব্যাপ্ত করিয়া দিবেন। দাঁড়াইতে, বসিতে, চলিতে, শুইতে, যাবৎ না নিদ্রিত হইয়া থাকেন তাবৎ, তিনি এই মৈত্রী-ভাবনায় নিবিষ্ট থাকিবেন।" চিত্তের এই অবস্থাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র ইহাকে ব্রহ্মবিহার বা সাধুজীবন আখ্যা দিয়াছেন। বৌদ্ধসাধনার শিরো-ভাগে এই অনির্ব্বচনীয় মৈত্রী ও মঙ্গল বিরাজিত। এই সাধনা মানবকে পরিণামে বিনাশের মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। পূজ্যপাদ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একপত্রে লিখিয়াছেন :—

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কি, সেটা দেখ্‌তে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নিগেটিভ্‌ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চল্‌বে না, যে অংশ পজিটিভ্‌ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই আসল কথা হয়, তা'হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়; কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে ভালবাসার দিকেই আসল লক্ষ্য। আমা-দের অহং আমাদের ভালবাসা স্বার্থের দিকে টানে, বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে আনন্দের দিকে নয়। এইজন্য অহংকে লোপ করে দিলেই সহজে সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। "পূর্ণিমা" ব'লে "চিত্রার" একটা কবিতা আছে; তাতে আছে একদিন সন্ধ্যার সময়ে নৌকায় ব'সে সৌন্দর্য্যতত্ত্বসম্বন্ধে একটি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যাই বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি নৌকায় সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোট বাতি আমার টেবিলে জল্‌ছিল বলে আকাশভরা জ্যোৎস্না ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি। বাহিরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য্য ভূলোক দ্যুলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেই রকম জিনিষ; অত্যন্ত কাছের এই জিনিষটা আমাদের বোধশক্তিকে চারিদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করিতেই পারি-নাই। এই অহংটুকু যেদিন নির্ব্বাণ হবে অমনি অনি-র্ব্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্ত্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণ-রূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধের লক্ষ্য তা' বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রীবিস্তার করতে বল্‌চেন। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্ব্বাপিত কর্‌তে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য তাঁর চারদিকে ভিড় করে আস্‌ত না।

মহাবগ্‌গে ষষ্ঠখণ্ডে লিচ্ছবি-সেনা-নায়ক নিগ্রন্থ সাধু সিংহের সহিত মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের একটি আলোচনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁহার সাধনার দুইদিকই সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম এই——"হে সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ অস্বীকার করি ইহা সত্য, কারণ আমি শিক্ষা দিয়া থাকি কোনো সাধক যেন বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় এমন কোনো ক্রিয়া করেন না যাহা অকল্যাণকর কিংবা যাহা মনে অকল্যাণ ভাব জন্মাইয়া দেয়।

হে সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ স্বীকার করি ইহাও সত্য কারণ আমি শিক্ষা দিয়া থাকি সাধক যেন বাক্যে কার্য্যে বা চিন্তায় এমন ক্রিয়াই করেন যাহা কল্যাণকর কিংবা যাহা মনে কল্যাণের ভাব জন্মাইয়া দেয়।

হে সিংহ, আমি উচ্ছেদবাদ ঘোষণা করি ইহা সত্য; কারণ আমি অহংকার কামাভিলাষ কু-ভাবনা ও ভ্রান্তির উচ্ছেদ ঘোষণা করি। কিন্তু আমি ক্ষমা প্রেম দাক্ষিণ্য ও সত্যের উচ্ছেদ ঘোষণা করি না।

হে সিংহ আমি বাক্যে কার্য্যে ও চিন্তায় অধর্ম্মাচরণ জুগুপ্সিত বা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করি।

হে সিংহ, আমি অহংকার, কামাভিলাষ, কুভাবনা ও ভ্রান্তির বিনয় অর্থাৎ অপনয়ন ঘোষণা করি; কল্যাণভাবের অপনয়ন ঘোষণা করি না।

হে সিংহ, আমি হৃদয়ের অকল্যাণভাবের তপ অর্থাৎ দাহন ঘোষণা করি কল্যাণভাবের দাহন ঘোষণা করি না।"

বুদ্ধের উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে বৌদ্ধ-সাধনা, বিশুদ্ধ আত্মহত্যার সাধনা নহে। বৌদ্ধসাধক আপনার অহংকার কামাভিলায হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া যে শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই অবস্থাটিই সাধনার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা কি না জোর করিয়া তাহা বলা চলে না। অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বুদ্ধের নিস্তব্ধতা আলোচনা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, যে মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতম অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, তাহার বাহিরে অতি উচ্চতম অবস্থাও আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বুদ্ধের অনন্ত-প্রসারী আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নির্ব্বাণের সীমাহীন আকাশ ভেদ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার নিস্তব্ধতাই ইহার একটি প্রমাণ। তিনি তাঁহার অনুগত ভক্ত ও সাধারণ লোকের দৃষ্টির সম্মুখে শান্তি ও কল্যাণের আকর নির্ব্বাণ-লোক উপস্থাপিত করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন; সে লোক অতিক্রম করিয়া কোন্ লোক রহিয়াছে তাহা বলেন নাই।

বুদ্ধের এই নির্ব্বাণসাধনার একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। তিনি সাধকের সম্মুখে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন, সাধক এই পথে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও অনিশ্চিতত্বের মধ্যে পড়িয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। সাধকের চলিবার বলিবার ভাবিবার ধ্যান করিবার মনন করিবার, সমস্ত বিষয়গুলি সুনির্দ্দিষ্ট এবং ধারাবাহিকরূপে সুবিন্যস্ত। কল্যাণপথগামী সাধককে যতখানি ইঙ্গিত করিলে তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি তাঁহাকে ততখানিই ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। রোগীকে তিনি ঔষধ দিয়াছেন, হয়ত অনাবশ্যক বোধে তাহাকে তাহার ব্যাধির মূলকারণটি বলেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়াও বুদ্ধদেব অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের রহস্যসম্বন্ধে নিরুত্তর ছিলেন; তাঁহার সেই নিস্তব্ধতা নিন্দুকদলের আক্রমণের একটি বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তা' বলিয়া এই সাধনার চরম-লক্ষ্যকে কোনোক্রমে পরিমিত বলা চলে না। নিরবশেষ আত্মত্যাগ করিয়া যে লাভ তাহাই পরম লাভ। সুতরাং বৌদ্ধসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম শ্রেয়ো লাভ করেন, ইহা ধ্রুব-নিশ্চিত।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

আবির্ভাব।

সন্ধ্যা আসে, কিরণের বরণ তাহার
দেবর্ষির হেমোজ্জ্বল জটার মতন
দিব্যকান্তি, নিশীথের তমোপারাবার
চাহি মুখে সবিস্ময়ে স্তম্ভিত চরণ!
সুদূর বনান্ত হতে ঝিল্লীর ঝঙ্কার
দেবর্ষির বীণাযন্ত্রে যেন হরিনাম,
দিবসের কল্লোলিত শব্দ পারাবার
স্তব্ধ হল, নত শিরে করিল প্রণাম।

২৫।৫।১২ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সীমা ও অসীমতা।

ধর্ম্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ—যাহা ধরিয়া রাখে। Religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ—যাহা বাঁধিয়া তোলে।

অতএব একদিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় মানুষ ধর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা।

কেন না সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতার আনন্দবিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্ম্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলি স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্ম্মও মানুষের মনুষ্যত্বকে তাহার সত্যসীমার মধ্যে স্ফুটতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয় যতই সুব্যক্ত হয় ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে—মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে অথচ সেই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। যাহা ছোট করে তাহাই বড় করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে

নির্দ্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা—বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়কে ব্যক্ত করে। গোলাপফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তু-বিশেষ কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে একদিকে বাঁধিয়াছে আর একদিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্যই দেখিতে পাই মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে—ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্ম্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে তেমনি যে মানুষ পবিত্রচিত্ত অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্যসীমায় বাঁধিয়াছে সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্ম্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমনতেমন করিয়া চলিতে পারিত—কাহারো কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজনাই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্‌স্ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য্য এবং সৌন্দর্য্যই সত্য। সত্যই সীমা; সত্যই নিয়ম; সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্ম্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতই মিথ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম মানুষকে বলিতেছে তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে। এইখানেই আমাদের অভয় আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমাগতি, ইনিই ইহার পরমাসম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখী একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কথনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ঙ্করকে বশ করিবার জন্য ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান, পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে—এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

মানুষ কথনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে সীমা জিনিষটা যেন তাহার নিজেরই জিনিষ, অতএব তাহার মুখে চুণকালী মাখাইলে সেটা আর কাহারো গায়ে লাগে না। কিন্তু মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল? এই সীমার অসীম রহস্য সে কিইবা জানে? তাহার সাধ্য কি সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে!

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম তখনই মানুষ বুঝিতে পারে এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব,—আর যিনি মানুষের ভগবান এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব।

সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা।

(একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন।)

কএক বৎসর হইতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একেশ্বরবাদিগণের একটি সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র একটি দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে এই সম্মিলন হইতে কোন মহৎ ফল উৎপন্ন হইতেছে ও হইবে কিনা সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। ইহার ইংরাজি নাম দেওয়া হইয়াছে—"All-India Theistic Conference"—ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন—কিন্তু ইহার কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এ নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে কি? ভারতীয় একেশ্বরবাদী বলিতে তো কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজকে বুঝায় না। ভারতে কি আর একেশ্বরবাদী নাই? ভারতীয় জনমণ্ডলীর একার্দ্ধ মুসলমান—একেশ্বরবাদী; বাবা নানক, কবীর প্রভৃতি একেশ্বরবাদীর সম্প্রদায়সমূহ ভারতবর্ষের নানাস্থানে একেশ্বরের পূজা করিতেছেন। আর্য্যসমাজ একেশ্বরবাদীর সমাজ। এতদ্ব্যতীত, হিন্দুসমাজকে ত্যাগ করেন নাই এমন কত শিক্ষিত ব্যক্তি ভারত ব্যাপিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় রত আছেন। "ভারতীয় একেশ্বরবাদীর সম্মিলন"-ক্ষেত্রে ইঁহাদের স্থান নাই কেন? ইহাদিগের স্থান শূন্য রাখিয়া সম্মিলন কি সঙ্গত ও সম্পূর্ণ হইতে পারে? কেন ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লওয়া হইতেছে না? যে ক্ষেত্রে বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য একেশ্বরপূজক অবাধে আসিয়া মুক্তহৃদয়ে মিলিত হইবেন তাহাকে ক্ষুদ্র প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া রাখা কথনই সঙ্গত নহে, ইহাকে "একেশ্বরবাদীর মিলনক্ষেত্র" করিতে হইলে ভগবানের নামে সকল একেশ্বরবাদীকেই ডাকিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির ক্ষেত্রে এইরূপ একটি মহাসম্মিলনের আয়োজন হইলে ভারতে এক মহাজাতিগঠনের সহায়তা হইবে। সকল একেশ্বরবাদীর মিলনের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। ভগবানের নামে যে মিলন হয়, শুধু রাজনৈতিক মিলন অপেক্ষা তাহা শতগুণে দৃঢ়তর এবং মঙ্গলতর।

এই সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য, সকল একেশ্বরবাদীর নিকট সম্মিলনের আহ্বান প্রেরণ করা এবং যাহাতে সকলেই আসিয়া মিলনকে সার্থক করিয়া তুলেন তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এত বড় একটি সম্মিলনকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা কথনই উচিত হইবে না এবং তাহাতে সম্মিলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। এই বৎসরের সম্মিলনেই যাহাতে এইরূপে কার্য্য হইতে পারে কর্ম্মকর্ত্তাগণ সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করেন এই আমাদের অনুরোধ।

একমাত্র ঈশ্বরের সকল পূজক অবাধে মিলিয়া, ভাব আদান প্রদান করিয়া, সম্প্রদায় ভুলিয়া, এককণ্ঠে পরম পিতার মহিমা কীর্ত্তন করুন এবং এই সম্মিলনীকে সার্থক করিয়া তুলুন। সম্মিলনের দ্বার দিকে দিকে উন্মুক্ত হউক—একজনমাত্র একেশ্বরবাদীও যেন এই দ্বারে প্রবেশ করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হন এবং সকলেরই নিকট যেন আহ্বান পঁহুছায়। এই অবাধ মিলনক্ষেত্রে ভারতীয় সকল একেশ্বরবাদী সম্মিলিত হইয়া একহৃদয়ে ভারতের মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং সকল ভারতবাসী কিরূপে একেশ্বরের উপাসক হইতে পারেন সে বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করুন; তাহার জন্য সমবেত সকলের আবেদনপত্র প্রেরিত হউক সেই রাজার দরবারে যিনি সকলের একচ্ছত্র সম্রাট। ইহা কত বড় কাজ!

(বিবাহ-আইন।)

আমাদের আর একটি নিবেদন আছে। শিশুকালের পক্ষে যাহা উপযোগী ও আবশ্যক, পরিণত বয়সের পক্ষে তাহাই উপযোগী নহে—বরঞ্চ ক্ষতিকর হইতে পারে। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ব্রাহ্মদের বিবাহ রেজেষ্টরী ব্যাপারকে সমাজের এইরূপ একটি শৈশবকালোচিত বিধান বলিয়া মনে করি।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার দলের চেষ্টায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ করেন। সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের দুই শাখা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুযাত্রিগণ এই আইন নিতান্ত অনাবশ্যকবোধে ইহার প্রতিবাদ করেন। আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ মহর্ষিদেবের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ৩ আইনের শরণাপন্ন হন নাই।

৩ আইনের সমর্থনকারিগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইতেছিল, আইনের চক্ষে তাহা অসিদ্ধ (invalid) হইতে পারে। তৎকালীন ন্যায়াধ্যক্ষ (Advocate General) মহাশয় এ আশঙ্কাকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেইজন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও

কয়েকটি কারণ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এই আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রহিত হইবে এবং বহুবিবাহ অর্থাৎ এক স্ত্রী বা স্বামীর বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী-গ্রহণ দণ্ডনীয় সুতরাং বর্জ্জনীয় হইবে। এই সকল গুরুতর বিষয় চিন্তা করিয়া সংস্কারকগণ এইরূপ একটি আইনের অত্যাবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্রমশঃ বহু ব্রাহ্ম এই আইনের কোন কোন ধারাকে অসমীচিন মনে করিয়া ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং সংশোধন চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। এই আইন দ্বারা সর্ব্বপ্রধান অনিষ্ট যাহা হইয়াছে তাহার সংশোধনের উপায় নাই। আইনের বিধান অনুসারে বিবাহার্থী ও বিবাহার্থিনীকে বলিতে হয়—"আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই, ইহুদি নই, জৈন নই, পার্শী নই" ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্রাহ্ম, প্রচলিত কোন সম্প্রদায়ের কেহ নহেন একথা, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। তবে, আমরা কি?—আমরা ব্রাহ্ম বলিলে কোন পরিচয়ই দেওয়া হয় না, কারণ ব্রাহ্ম কোন জাতি নহে। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য ব্রাহ্মেরা ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই হইয়াছে। নিজের জাতিকে অস্বীকার করিতে গিয়া ইঁহারা আপনার দেশে আপন জাতির মধ্যে বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছেন। দেশীয় খৃষ্টান ভ্রাতৃগণের অবস্থা সকলেই জানেন। ইঁহারা যেন মাতৃক্রোড়চ্যুত সন্তানের ন্যায় দেশের নিতান্ত উপেক্ষিত ক্ষুদ্র দল। ব্রাহ্মগণও কেন এ বিকৃতি মাথা পাতিয়া লইতেছেন?

অসবর্ণ বা বিধবাবিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ হইতে পারে—এইটিই সেকালের প্রধান যুক্তি ছিল। এখন ৪০ বৎসর পরে সাহস করিয়া বলা যায়, এ আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। দেশময় এখন ব্রাহ্মপরিবার ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজের অনেকে জ্ঞানে, চরিত্রে, কৃতিত্বে, পদে, গৌরবে দেশের শীর্ষস্থানে সমাসীন। এখন যদি ব্রাহ্মগণ এই আইনকে বর্জ্জন করিয়া আপনাদের মত ও বিশ্বাস অনুসারে আপনাদের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, গভর্ণমেণ্টকে তাহা আইনানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিম্নশ্রেণীর বিবাহ-প্রণালীকে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং করিয়াও থাকেন। এখন যদি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ এক হইয়া এ কলঙ্ক মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে কেন সফলকাম হওয়া যাইবে না তাহার কোন কারণ দেখি না।

হিন্দুবিবাহ বলিলে আমরা কি বুঝি? হিন্দুশাস্ত্রে তো নানাপ্রকারের বিবাহের বিধান আছে। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতি অবাধে চলিয়াছে। তবে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে কেন? ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মসমাজ কি সর্ব্বপ্রধান নহে? তবে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মানুশাসিত ও সমাজানুমোদিত বিবাহকে অর্থাৎ বিবাহের ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকেই যথেষ্ট মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কেন পারিবেন না?

আইন সংশোধন করা সহজ নহে, সম্ভব কি না জানি না। গত বৎসর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিপুল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। রাজদ্বারে সংশোধনের আশা আর শীঘ্র দেখা যাইতেছে না। একমাত্র উপায় ব্রাহ্মদের নিজেদের হাতে রহিয়াছে, তাহা ৩ আইনকে বর্জ্জন করিয়া বিবাহঅনুষ্ঠান সম্পাদন করা। রাজবিধি দ্বারা পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনকে দৃঢ়ীকৃত করিবার চেষ্টা আমাদের দেশে কোনকালে ছিল না।

ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন নিকটবর্ত্তী। আশা করি, সমবেত ব্রাহ্মনায়ক এবং ব্রাহ্মগুরুগণ এই সম্মিলনে এ বিষয়টির আলোচনা বিধিমতে করিবেন।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

জানা কথা।

আপনাকে যে পারবে দিতে
জগৎখানি হবে তার,
আদ্যিকালের পুরাণ পুঁথি
দিতেছে এই সমাচার।
সকল শাস্ত্রে গাত্রে গাত্রে
খোদাই করা এই কথা,
শুনবে তুমি লোকের মুখে
দোহাই এরই সর্ব্বথা।
বাদ্যি বাজে সভার মাঝে
এই কথাটি সবাই গায়,
ঢাক্ বাজায়ে বাক্ সাজায়ে
সবাই জগৎ কিন্‌তে চায়।
কেমন করে দেবে ধরে
আপ্‌নাকে, তার কই খবর!
এই কথাটি জানতে গেলেই
জবাবটুকু পায় জবর।
শুধুই টানি' নিতে জানি
দিতে তো ভাই জানি না,
তাই কথাটি কানেই শুনি
কাজে তো তায় মানি না।

মোদের মেলা নেবার বেলা
দেবার বেলা সব বাকি,
কবি কহে তাইতে জগৎ
নিত্য মোদের দেয় ফাঁকি।
শ্রীহেমলতা দেবী।

নানা কথা।

কথিত আছে, পুরাকালে রোমসাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রোমের বিখ্যাত শান্তিমন্দির জেনাসের মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ হইত। একদা প্রথম রোমসম্রাট অগষ্টান কিঞ্চিদধিক আড়াই শত বৎসর পরে রোমের এই বিখ্যাত মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। ইটালিতে না হউক, রোমসাম্রাজ্যের প্রান্তে তখনও কিন্তু খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছিল। লোকের ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্বোধনের জন্য না হউক, যুদ্ধের ভীষণতা বর্ত্তমান সময়ে এতই প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্ব্বের ন্যায় শতাব্দী ধরিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা এখন কোন দেশের পক্ষেই আর সম্ভব নহে। অধুনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগদ্ব্যাপী—প্রাচীন রোমসাম্রাজ্য অপেক্ষা কত বিশালতর! কিন্তু এই ব্রিটিশসাম্রাজ্যেও গত ২৫০ শত বৎসরের মধ্যে জেনাসের শান্তিমন্দিরের দ্বার অধিকাংশ সময়ই অবরুদ্ধ ছিল। অনেকবার খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার অবরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই আড়াইশত বৎসরের মধ্যেই কি গুরুতর পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে! এখন জগতে উত্তরোত্তর যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য কত আয়োজন হইতেছে! সমুদয় সভ্য জাতিই জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য এখন কত ব্যগ্র! হেগ সহরে শান্তি-কংগ্রেস, ও অন্তর্জাতিক সালিশী বিচারালয় সভ্যজাতির মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কিছু পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে মরক্কো প্রদেশের, সামান্য একটুখানি যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলে এক ইটালি ও তুরস্কের যুদ্ধই জগতের শান্তিদেবীর মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ হওয়ার একমাত্র অন্তরায়। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে এই উভয় দেশেও শান্তি স্থাপিত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। তুরস্কের রাজমন্ত্রিগণ শান্তি সংস্থাপনের এই প্রয়াস সফল হইবে বলিয়া বিলক্ষণ আশা করিতেছেন। সমস্ত সভ্য জগৎ এই যুদ্ধের অবসানে প্রকৃতই আনন্দিত হইবে। এইবার জগতে জেনাসের মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে তাহা শীঘ্র আর খুলিবে না ইহাই সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। মানবদৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায় তাহার দ্বারা বিচার করিলে মনে হয় যে, জগতের তিনটি কেন্দ্রে অশান্তির বীজ উপ্ত রহিয়াছে। এই তিন কেন্দ্র হইতে সমরানল প্রজ্জলিত না হইলে জগতের শান্তি সংক্ষুব্ধ হইবার অধিক সম্ভাবনা নাই। ইউরোপে তুরস্ক, এসিয়ায় পারস্য এবং চীন, এই তিন কেন্দ্রেই অনেকদিন হইতে মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছে। কখনও কখনও প্রাকৃতিক প্রবল ঝটিকা আসন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, কখনও বা আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে তুরস্কের আকাশে মেঘসঞ্চার দেখা যাইতেছে। তাহার বিপদের যেন আর অবধি নাই। একে ইটালির সহিত যুদ্ধ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিরাম চলিতেছে, তাহার উপর প্রাকৃতিক বিপ্লব! ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার কত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত দরিদ্র প্রজা গৃহহীন হইয়াছে, কত গৃহ জনশূন্য হইয়াছে। এখানেও তাহার বিপদের শেষ হয় নাই। গৃহে ঐক্য ও শান্তি বিরাজিত থাকিলে এবং সমস্ত শক্তি এক কেন্দ্রে স্থিত করিতে পারিলে বিপদ যত গুরুতরই হউক না কেন, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তুরস্ক একদিকে যেমন বিপদজালে জড়িত, তেমনই তাহার গৃহে শান্তি নাই, ঐক্য নাই, অন্তর্বিবাদে জর্জ্জরিত। নব্য তুর্কী সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র (কমিটি অব্ ইউনিয়ন্ এণ্ড প্রোগ্রেস) ঐক্য ও উন্নতি-বিধায়িনী সভার—সুলতান ও রাষ্ট্রীয় সভার নিকট যেন আর তেমন প্রতিপত্তি নাই। মধ্যে: সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল—অতি কষ্টে সে বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছে। অনেক সৈন্যাধ্যক্ষেরও এই বিদ্রোহে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ যোগ ছিল। পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। সুলতান নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু প্রধান মন্ত্রী অতিকষ্টে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। এদিকে তুরস্কের প্রধান বিপদ ও দৌর্ব্বল্যের কারণ,—তাহার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের অধীরতা এবং স্বাধীনতা-লাভের জন্য ব্যগ্রতা। একদা গ্রীস, রুমেনিয়া, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো প্রভৃতি সমুদয় দেশ তুরস্কের অধীন ছিল। ক্রমে এক এক করিয়া সকলেই তুরস্ক হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। সকলেই স্বীয় স্বীয় কলেবর ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বত্রই ব্যগ্র। যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা যেন এখানে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। ক্রীট গ্রীসের সহিত যুক্ত হইবার জন্য একবার যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্প্রতি সেখানে পুনরায় অশান্তির লক্ষণ দেখিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ তথায় যুদ্ধের জাহাজ প্রেরণ করিয়াছেন। মণ্টিনিগ্রোর সহিত যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তিতায় সে বিপদ কাটিয়া

গিয়াছে। তুরস্কের অন্তর্গত এল্‌জেরিয়া প্রদেশের খৃষ্টীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিলক্ষণ অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান আছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহারাও স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াসী। এক এক করিয়া তুরস্ক হইতে পাঁচ ছয়টি স্বতন্ত্র রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে—তুরস্কের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ ইউরোপের অন্য রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তুরস্কের নিস্তার নাই। অসন্তোষের মেঘ এই সমস্ত প্রদেশে ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইতেছে। সমগ্র ইউ-রোপের এই প্রদেশই সর্ব্বদাই আশঙ্কার কারণ হইয়া রহিয়াছে। তুরস্কে এতদিন পরে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয়ান প্রজাবৃন্দেরা রাষ্ট্রীয় সভায় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় ক্ষমতা লাভ করিল। কিন্তু তাহাতেও বোধ হয় অসন্তোষের কারণ নিরাকৃত হইল না।

পারস্যের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর সে দেশ কত বিপদের মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু ইংলণ্ড ও রুশিয়ার দ্বারা প্রবলরূপে অভি-ভূত হওয়ার জন্য প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতার অল্পই অব-শিষ্ট আছে। তাহাদেরই অভিলাষ অনুসারে সর্ব্ববিষয়ে পারস্যকে চলিতে হইতেছে। এমনকি, তাহার আভ্যন্তরীন অরাজকতা-নিবারণ ও শাসন-সংস্কারে তাহার যথেচ্ছা চলিবার জো নাই। ইহাতে তাহার স্বাধীনতার নাম রক্ষা হইতেছে বটে কিন্তু জাতীয় শক্তি ক্রমেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

কোনও দেশের শাসন-প্রণালীর হঠাৎ পরিবর্ত্তনসাধন নিতান্ত সহজ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে অরাজকতা কিয়ৎ-পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চীনসাম্রাজ্যের ন্যায় বিশাল দেশে, এইরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তনের পরেই দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু চীনের নেতৃগণ যেরূপ দৃঢ়তা, স্বার্থ-শূন্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় চীনে শান্তি-সংস্থাপন সুদূরপরাহত নহে। চীন-সাধারণতন্ত্রের সভাপতি বিদ্রোহী সৈন্য-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। নির্ভীকতার সহিত দুই জন শক্তিশালী বিদ্রোহী সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিয়া-ছেন। মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে চীনের এই রাষ্ট্রবিপ্ল-বের প্রাণস্বরূপ ডাক্তার স্যানইয়াট্ সেন নিহত হইয়া-ছেন। কিন্তু গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। গৃহচ্যুত স্যান ইয়াটসেন সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং চীনে গৃহ-বিবাদের তাদৃশ সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়।

কৃষি-উন্নতির দৃষ্টান্ত।

ডেনমার্ক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম্মিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা নরনারীকে সরকারের সাহায্যে একটি পরিবারের ভরণপোষণ সহজে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এরূপ জমিজমার সংস্থান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ডেনমার্ক রাজসভা যে আইন প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় ডেনমার্কাধিপতি দেশের উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। এই আইন প্রচলিত হইলে বহু যুবক আপনার পথ কাটিয়া লইবার সুযোগ পাইবে এবং যাহাদের শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধির অপব্যবহার হইতেছিল তাহারা সর-কারের সাহায্যে জমিজমা লাভ করিয়া একান্তমনে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ-সহস্রের অধিক জোতদারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা-দের মধ্যে অধিকাংশই সফলতা লাভ করিয়াছে।

ডেনমার্কের রাজা তাঁহার প্রজাপুঞ্জের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া-ছেন, আমাদের দেশের জমিদারবর্গ সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে বঙ্গদেশের শ্রী ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। আবার অন্নপূর্ণার মন্দিরে বাংলার নরনারী দুইবেলা কিছু প্রসাদলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু হায়, দেশের অধিকাংশ জমিদার সর্ব্বাঙ্গে আলস্য জড়াইয়া দিব্য আরামে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দুরদৃষ্টবশতঃ যাহাদের সুখদুঃখের ভার তাহাদেরই উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহারা দিন দিন হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে; পেটে অন্ন নাই, মহাজনের দেনায় একেবারে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া বসিয়া কোনো প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রাণটুকু ধরিয়া আছে।

কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই শ্রমজীবিগণের মধ্যে একটি অসন্তোষের কারণ জমিয়া উঠিতেছে। কে জানে পশ্চিমগগনের ঈশানকোণের এই মেঘখানি একদিন ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌঁছিবে না? এখনও সময় আছে, আমরা প্রস্তুত হই। আর, যদি জোর করিয়া আমরা আলস্যে কালাতিপাত করি, তবে তজ্জন্য আপশোষ করিবার কারণ একদিন ঘটিবেই।

আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং তাহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কৃষি-উন্নতির পক্ষে ইহা একটী প্রধান অন্তরায়। জমি-দারগণ সচেষ্ট হইলে ইহার একটা প্রতিকার হইতে পারে। অনেক জমিদার এক-একজন জোতদারের

অধীনে পাচশত, হাজার, এমন কি, দুহাজার বিঘা জমি পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহার ফল ভাল হইতেছে না; প্রথমতঃ এই জোতদারশ্রেণী অত্যন্ত অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া উঠে; প্রজার নিকট উচ্চ নিরিখে খাজনা আদায় করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এই শ্রেণীর জোতদারেরা চাষের কোনো উন্নতি সাধন করে না। এই নিমিত্ত ডেনমার্ক রাজসভা একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার অধিক জমি কাহাকেও দেওয়া হইবে না, কিন্তু যদি কোনো কর্ম্মনিপুণ যুবক কৃষিকর্ম্মের বিশেষ উন্নতি করিয়া থাকেন, আবশ্যক হইলে সরকার হইতে তাহাকে অতিরিক্ত সাহায্য করা হইতে পারে। ডেনমার্কে কোনো জোতদার নয় বিঘার কম জমি লইতে পারিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ডেনমার্কে একটী কৃষক পরিবার ঐকান্তিক চেষ্টা ও উৎসাহের সহিত নয় বিঘা জমি চাষ করিলে, তাহা হইতে কোনোপ্রকারে তাহার ভরণপোষণ চলিতে পারে। অবশ্য ইহা জমির অবস্থা ও চাষবাসের সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করে।* বাংলদেশের সর্ব্বত্রই জমিদার আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ জমিদারীতে কতবিঘা জমি হইলে একটি কৃষক-পরিবারের দুইবেলা পেটভরিয়া খাইবার সংস্থান হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তার পর, সেই পরিমাণ জমি ও বাসের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ফসলের বীজ সার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে এবং নূতন ফসলের প্রবর্ত্তন করিলে আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

বাংলাদেশের বহুসংখ্যক কৃষকের মাথা মহাজনের কাছে বিক্রীত। মহাজন কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী কিছু সম্বল রাখিয়া কৃষকের সমস্ত পরিশ্রমের ফলটুকু নিজেই আত্মসাৎ করে। আমাদের দেশে হীনশ্রী কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে মহাজনেরা যাহাতে পল্লীবাসিগণের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া নিঃশেষে রক্তশোষণ করিতে না পারে, সে বিষয় দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রেও জমিদার এই সমস্যার মীমাংসায় সহায়তা করিতে পারেন। পাঁচ দশটি গ্রাম লইয়া একটা ব্যাঙ্ক (Village Bank) স্থাপন করিয়া কৃষিকর্ম্ম-পরিচালনার নিমিত্ত স্বল্পসুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে মহাজনের গ্রাস হইতে চাষীদিগকে রক্ষা করিবার আর কোনো উপায় নাই। ডেনমার্ক কেন, যে সকল দেশে কৃষি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সর্ব্বত্রই কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া অর্থপিপাসু মহাজনের হাত হইতে কৃষকদিগকে বাঁচাইবার জন্য একান্ত চেষ্টা দেখা গিয়াছে।

যাহারা বিভিন্ন দেশীয় পল্লীগ্রামের অবস্থা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে, যে দেশে কৃষকের জমি তাহার নিজস্ব নহে, সেখানে কৃষি-উন্নতির জন্য যেমন উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। আমাদের বাংলাদেশের কৃষকদের লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যে জমিতে ইহারা ধান দেয়, যদি সেই জমি ক্রমশঃ উর্ব্বরা হইতে থাকে, কৃষক অত্যন্ত সশঙ্কিতচিত্তে উক্ত জমি চাষ করে—পাছে জমিদার জানিতে পারেন, তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। ধানী জমির নিরিখ অপেক্ষা পাটের জমির নিরিখ বেশি। এই প্রকার ব্যবস্থা কৃষি-উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। কোথায় জমিদার জমির উন্নতি সাধন করিলে প্রজাকে পুরস্কৃত করিবেন, না, তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপর আরো কিছু দাবী করিয়া কৃষক ও কৃষি উভয়কেই খর্ব্ব করেন। স্বদেশানুরক্ত কোনো কোনো কর্ম্মী দুঃখ প্রকাশ করেন যে আমাদের কৃষকদের মধ্যে Co-operation-এর অত্যন্ত অভাব। কিন্তু কৃষকদের উপর এই অভিযোগ কতদূর সত্য ও সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। ইহাদের বুকের উপর বহু কাল ধরিয়া আমরা যে পাষাণ চাপাইয়া রাখিয়াছি, তাহা একটি একটি করিয়া ঠেলিয়া ফেলি, দেখিব, ইহাদের মধ্যে সম্মিলিত হইবার শক্তির তেমন অভাব হয় নাই। ডেনমার্ক, আয়র্ল্যাণ্ড, হলাণ্ড, প্রভৃতি দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় বহু প্রকার যৌথ-কারবার স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু রাজ-সরকারের সহায়তা ভিন্ন ইহা সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ডেনমার্ক-দেশীয় শ্রমজীবীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া রাজ-সরকার যখন তাহাদের পথ একটু পরিষ্কার করিয়া দিলেন অমনি অল্পকাল মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হইল। নিজের পায়ে ভর দিয়া মাতৃভূমির মধ্যে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া জীবন সার্থক করিবার নিমিত্ত ইহাদের প্রাণ উদ্বোধিত ছিল; ইহাদের অন্তরে স্বাধীনতার মন্ত্র এমন করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল যে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে নিজেদের চেষ্টাকে উৎসর্গ না করিয়া তাহারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না। যখন রাজ-সরকার আইন প্রচলন করিলেন, সহর হইতে দলে দলে শ্রমজীবিগণ সামান্য জমি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল—কারখানার কঠিন ইট পাথরের বেষ্টনে তাহাদের জীবনকে চিরদিনের মতন পঙ্গু করিয়া রাখিবার বন্ধন হইতে তাহারা মুক্তি লাভ করিল। ইহার ফলে ডেনমার্কের পল্লীসমাজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে, শ্রমজীবীদের সন্তানসন্ততি পল্লী-সৌন্দর্য্যের মাঝখানে প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, সহরের নানা বিকৃত অস্বা-

* ডেনমার্কে বৃহৎ জোতদার অপেক্ষা সামান্য জোতদারের অবস্থা ভাল।

তাত্ত্বিক অবস্থা ইহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না।

ডেনমার্কের রাজা ও কতিপয় স্বদেশসেবী একত্র হইয়া কৃষি-উন্নতির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন আমাদের দেশের জমিদারবর্গ কি তাহা হইতে কিছু শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন না? তাঁহারা কি বৃহৎ জোতদারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া, নিঃস্ব প্রজাকে মৌরশী পাট্টা দিয়া, মহাজনের হাত হইতে বাংলার কৃষকদের রক্ষা করিয়া, গ্রামে গ্রামে কৃষি-উন্নতির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট বীজ, সার, ইত্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া, নূতন ফসলের প্রবর্ত্তন করিয়া এবং নিজেরা প্রজাপুত্রের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধন করিবার উদ্দেশে এই হতভাগ্য দেশের স্ব স্ব গ্রামে বাস করিয়া যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

চিঠি।

ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

শ্রাবণের তত্ত্ববোধিনী সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। আশাকরি এই মত প্রতি মাসেই বিদেশস্থ আশ্রমবাসীদিগকে পত্রিকা প্রেরণ করিয়া আনন্দিত করিবেন।

কেবল আশ্রম-কথা পড়িয়া আমাদের যাহা মনে হইতেছিল তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম; আশাকরি এই পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন।

আশ্রম-জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং বিদায়সম্ভাষণ আমরা পূর্ণ অন্তঃকরণে গ্রহণ করিলাম। এই স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষীর গ্রহণে এবং নীর ত্যাগে সাহায্য করিবে। আশ্রম হইতে যত দূরে যাইতেছি আশ্রম-জননীর স্নেহের বন্ধন ততই দৃঢ় ও গভীর ভাবে অনুভব করিতেছি। সন্তান মাতৃক্রোড় হইতে দূরে যাইয়া যেমন মাতৃস্নেহ অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করে আমরাও তেমনি আশ্রমের ভাবসম্পদকে আরও বৃহত্তরক্ষেত্রে নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি। ভারতের অন্তরতম যে একটী বাণী আমাদের আশ্রমের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিলাভ করিতেছে পশ্চিম তাহার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে। আমাদের ছাতিমতলায় মহর্ষির সাধনাবেদীর উপরিস্থিত প্রস্তরে খোদিত—"তিনিই আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি," এই বাণীকে সংগ্রামপূর্ণ পাশ্চাত্য জগতে বহন করিয়া আনিবার ভার আমাদের প্রত্যেক আশ্রমবাসীর উপর পড়িয়াছে। আমাদের আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকের চরণে এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন এই মহান্ দায়িত্বকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিদিন জীবনকে জাগ্রত সাধনায় সচেতন রাখেন। আমরা অযোগ্য জীবন লইয়া এদেশে আসিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া প্রতিদিন অনুতপ্ত হইতেছি। ভবিষ্যতে যাঁহারা এই কর্ম্মোদ্যমময় দেশে আসিবেন তাঁহারা যেন সাধনার জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া আসিতে পারেন ইহাই ভগবানের চরণে একান্ত প্রার্থনা।

আমরা প্রতিদিনই আশ্রমজননীর স্নেহহস্তের সংস্পর্শ অনুভব করিতেছি। এবং সেইজন্য "কিছুকালের জন্য আমরা আশ্রম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম"—একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। আশ্রমের সহিত ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদও আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে!"

বিনীত—
শ্রীকালীমোহন ঘোষ
লণ্ডন। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মণ
শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহ
শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

আশ্রম কথা।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাৎসরিক।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাৎসরিক উপলক্ষ্যে গত ২৭ এ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে অপরাহ্নে এক সভা এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। সে দিন অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।

ছাত্রগণ অতি সুন্দর করিয়া পুষ্প দ্বারা সভাগৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং সভার কার্য্যের কিছু কিছু অংশও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ নন্দী সর্ব্বপ্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া তাহা পাঠ করেন। তাহার পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজা রামমোহনরায়ের জীবনচরিত হইতে

নির্ব্বাচিত কয়েকটি চমৎকার অংশ আর কয়েকজন ছাত্র পরে পরে পাঠ করিয়া ছিলেন।

ছাত্রগণের পাঠ শেষ হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় রাজা সম্বন্ধে কিছু বলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজসংস্কারে, রাষ্ট্রে, সকল দিকে যে রামমোহন রায়ের আশ্চর্য্য প্রতিভা কিরূপ অসামান্যরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা রাজার জীবনী হইতে নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছিলেন। রাজা নানা ধর্ম্মের সকল বিকৃতি ভেদ করিয়া তাহাদের আসল মর্ম্মস্থানকে যে কিরূপে দেখিতে পাইতেন এবং সেই কারণে সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক ঐক্যের বার্ত্তা তিনিই যে প্রথম ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও বক্তা মহাশয়ের কথার ভিতর হইতে বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজার চিত্ত সকল মানুষের মধ্যে বিহার করিয়াও যে আপনার জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে কোন দিন নষ্ট করে নাই, রামমোহন রায়ের সেই বিশেষত্বের কথা বলিয়া নেপাল বাবু তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার পরে কিছু বলিয়াছিলেন। সাধারণত সমাজসংস্কারকগণ যেরূপ উগ্র ও অস্থিরভাবাপন্ন হন—তাঁহাদের উৎসাহের অগ্নি চতুর্দ্দিককে দগ্ধ করিয়া যেরূপ তাঁহাদিগকেও যেন দগ্ধ করিতে থাকে—রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের কাজের মধ্যে সেই ব্যস্ততার ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। তাঁহার মধ্যে যে স্থৈর্য্য ও প্রশান্তভাব দেখা গিয়াছিল, লুথর প্রভৃতির মধ্যে তাহা বিরল।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন যে রামমোহন রায় এমন একটি পূর্ণ মানুষ ছিলেন যে তাঁহাকে কোন বিশিষ্টতার দ্বারা চিহ্নিত করা অসম্ভব। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সাধক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সমস্তই ছিলেন, অথচ ইহার কোন একটিকে বড় করিয়া দেখিলে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটিকে দেখা হইবে না—কারণ একটি সুগঠিত অবয়ববিশিষ্ট শরীরে যেমন কোন একটি অঙ্গবিশেষ সকলকে অতিক্রম করিয়া গোচর হয় না, তেমনি এ সমস্ত তাঁহার সেই অখণ্ড মানুষটির মধ্যে এমনি মিলিয়া আছে যে, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য চোখেই পড়ে না। রামমোহন যে কোন বিশিষ্টতার দ্বারা বিশিষ্ট নন্ ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতা।

সেই কারণে জগতের আর কোন মহাপুরুষের মধ্যে যেটি দেখা যায় নাই রামমোহনের মধ্যে সেই জিনিসটি দেখা গিয়াছিল। তিনি একই সময়ে ধ্যানের অভ্রভেদী হিমাদ্রিশিখরে এবং লোকালয়ের কলকোলাহলের মধ্যে থাকিতে পারিতেন। গঙ্গার মত তিনি কোন্ লোকচক্ষুর অনধিগম্য রহস্যময় লোক হইতে আপনার ভাবের ধারাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতেন এবং মানবপ্রেমে মানুষের পঙ্কিমা আবিলতার মধ্যে, উত্তপ্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে 'ব্রাদার' বলিয়া হাতে ধরিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবধান ছিল না। অন্য মহাপুরুষের কাছে শিষ্য হইয়া ধর্ম্মার্থী হইয়া অনেকে গিয়াছেন এবং পূর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু রামমোহন কাহারও গুরু ছিলেন না; তিনি যে সকল লোকের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই তাঁহার অন্তরের অন্তরঙ্গ ছিলেন না—তাঁহাকে বুঝিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে রামমোহনকে তাহা কোন বাধা দিত না। ভাব এবং কর্ম্ম যে দুইটি জিনিস পৃথিবীতে চিরদিন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে—ইঁহার কাছে তাহারা একেবারে এক ও অব্যবহিত ছিল। ইঁহাকে তাই কোন নির্জ্জনতা অন্বেষণ করিতে হয় নাই। যাহা ভাবরূপে পাইয়াছেন, কর্ম্মের মধ্যে তাহারি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু সে কি সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তি—ক্ষণকালীন প্রয়োজন-সাধনের মূর্ত্তি? তাঁহার সেই সুদূরের দৃষ্টি ছিল যাহাতে তিনি নিকটের মধ্যে দূরকে, খণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণকে, বর্ত্তমানের সকল তুচ্ছতা বিকৃতির মধ্যে ভাবীকালের নির্ম্মল অপরূপতাকে দেখিতে পাইতেন। সেই আনন্দে তাঁহার সকল বাধা ভাসিয়া যাইত, মানুষের কাছে আসিয়া 'ব্রাদার' বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিতে পারিতেন। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় কি দ্বন্দ্বশীল তিনি ছিলেন, কিন্তু কাজের হাটে—যেখানে নদীর ফেনায়িত মূর্ত্তি দেখা যায়—অথচ তাহারি ভিতরে মধ্যে মধ্যে এমন একটি সুদূরের আভাস পাওয়া যায় যাহা তাঁহার ধ্যানশীলতার পরিচয় দেয়। ধ্যান তাঁহার এইখানেই—কাজের মধ্যে, হাটের মধ্যে—গাড়িতে চলিতে চলিতে তাঁহার উপাসনা।

এই অখণ্ড মনুষ্যত্বটি তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছিল বলিয়াই তিনি এ যুগের গুরু হইয়াছেন। মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সকল দিক্ হইতে বড় করিয়া দেখা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি যে সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিতেন তাহার শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া তিনি থামিতে পারিতেন না। জুরিস্ প্রুডেন্স—আইন-তত্ত্ব—পড়িতে আরম্ভ করিলেন তো সমস্ত আইনতত্ত্ব পড়িলেন—এমন কি আয়র্লণ্ড যাইবেন সংকল্প করিয়া তিনি কেল্টদিগের সময়ে Bruhan Law নামক এক অতি পুরাতন আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মানুষকে তিনি অখণ্ড করিয়া না দেখিয়া আংশিকভাবে দেখিতেই পারিতেন না; কারণ তাঁহার নিজের প্রকৃতির মধ্যে আংশিকতা কোথাও ছিল না।

সায়াহ্নে বালকগণ পদ্মফুলে মন্দির সাজাইয়া ধূপ জ্বালিয়া চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকগণ মধুরকণ্ঠে একটি সঙ্গীত করিলে পর স্বাধ্যায় ও উপাসনা হইল। তারপর ক্ষিতিমোহন বাবু রাজার উপরে একটি অতি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন ও স্থানে স্থানে তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই একটি সুন্দর কথা দিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পিতৃপক্ষে রামমোহন রায়ের এই শ্রাদ্ধদিবসটি পড়িয়াছে; যে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পিতৃগণের, আচার্য্যগণের ও ঋষিগণের তর্পণ সকল ভারতবাসী করিতেছে। এই সময়ে যে আমরা এই যুগগুরুর শ্রাদ্ধ করিতে পাইয়াছি, ইহা খুবই আনন্দের কথা। কারণ ইনি এমন একজন মহাপুরুষ যিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন,—যাঁহাকে কোন বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে কোন দিনই কেহ টানিতে পারিবে না। তিনি একটি উপমা দিলেন, গঙ্গার স্তব হইতে। গঙ্গাকে একজন স্তব করিয়াছেন যে, সকল তীর্থের সঙ্গে তীর্থকে গঙ্গা গ্রথিত করিয়া লইয়া এক মহাসাগরের

অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। রামমোহন রায়ের চিত্তও সেইরূপ বিশ্বের সকল তীর্থের মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে, কত মত, কত ধর্ম্মের মধ্য দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন তীর্থই তাঁহাকে তাহার বিশেষ জিনিস করিয়া লইতে পারে নাই। তিনি সেই সকলের মধ্য দিয়া গিয়া সেই একের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন যেখানে সকলেরি গতি।

তিনি এই যুগগুরু—এই যুগে এমন একটি ব্যাপার হইয়াছে যাহা আর অন্য কোন যুগে হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে সকল জগতের সমস্ত ব্যাপার এমন করিয়া মানুষের প্রত্যক্ষ হয় নাই। এক এক দেশের এক এক সভ্যতার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম তাহার আপন আপন স্থানে বসিয়াছিল—সকলকে মিলাইবার মত একটি ধারা তাহাদের মধ্যে আসে নাই—সকলেই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া এককেই চাহিয়াছে এবং জানিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। এই যুগে যেমনি সেই প্রয়োজন জানিল, অমনি তাহাকে মিটাইবার মানুষও দেখা দিলেন।

কিন্তু এই বাংলাদেশের তখন এমন কি সাধ্য যে তাঁহাকে খাদ্য জোগায়? বিনতা কামনা করিয়াছিলেন যেন তাঁহার মহৎ সন্তান জন্মলাভ করে—তাই, যখন গরুড় জন্মলাভ করিলেন তখন 'খাদ্য কোথায়' বলিয়া তিনি চিৎকার করিলেন। বিনতার সাধ্য কি যে তাঁহার খাদ্য জোগান—তাঁহাকে কোন্ দূরে ছুটিতে হইল খাদ্যের অন্বেষণে। সেইরূপ দুঃখিনী বঙ্গজননী তাঁহার দুঃখমোচনের জন্য মহৎ সন্তান কামনা করিতেছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় যখন জন্মিলেন তখন তাঁহার খাদ্য তিনি জোগান্ এমন সাধ্য তাঁহার কোথায়! রামমোহনকে খাদ্যের অন্বেষণে কত স্থানে ঘুরিতে হইল—দুর্গম হিমগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে যাইতে হইল। কত দেশদেশান্তরে তাঁহাকে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি যে এই নানা ধর্ম্মের ভিতর হইতে তাঁহার আত্মার পরিপুষ্টি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত তিনি কি একটা তাল পাকাইয়া জড়পিণ্ডের মত তৈরি করিয়াছিলেন? এখানে কিছু, ওখানে কিছু—এরূপ নানা স্থানের নানা সংগ্রহের জড়সমষ্টি কি তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয় ছিল? না—(এইখানে বক্তা মহাশয় রামমোহনের গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিলেন) স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি এমন একটি কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন যেখানে চক্রের সকল নেমিগুলিকে তিনি একই কেন্দ্র হইতে নানা দিকে ধাবিতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সকল সত্যের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে দেখাই চিরদিন ভারতবর্ষের বৃহৎ প্রতিভা। বৃক্ষের একটা উপমা এখানে দেওয়া যায়। মূলের দিকে বৃক্ষের কোন বিচিত্রতা নাই—পরিবর্ত্তন নাই—অথচ উপরের দিকে ক্রমাগতই কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখা—ফুলফল, নানা বিচিত্রতা। ভারতবর্ষও সেই মূলটিকে নিজের ভূমিতে স্থির রাখিয়া সকল পরিবর্ত্তনকে তাহা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিয়াছিলেন। নহিলে যদি মূলকে উপরে দিয়া আর শাখাপ্রশাখাগুলিকে নিজের ভূমিতে পুঁতিয়া ধর্ম্মসমন্বয় করা হইল মনে করা যায় তবে সে বৃক্ষের প্রাণ বাঁচে কি? আমাদের দেশের যেখানে প্রতিভা, যেখানে প্রাণ সেইখানে রামমোহন রায় ছিলেন—সেইখানে গিয়া তার পর তিনি আপনার উপরে অজস্র বৈচিত্র্য ফুটাইয়াছেন—কিছুতেই তাঁহার বাধে নাই। সেইজন্য আমাদের দেশের চিরাগত-প্রথানুসারে তিনিও গীতার, উপনিষদের নূতন করিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন—কিন্তু এবার ভারতবর্ষ যে ভাষ্য লাভ করিল তাহা আর কোন সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হইল না—তাহা ভারতবর্ষের চিরন্তন তত্ত্বকে সকল বিশ্বতত্ত্বের মাঝখানে স্থির ভূমি দান করিল।

বক্তা মহাশয় তার পর রামমোহনের গ্রন্থ হইতে আরও কএকটি স্থান পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে একটি বেদগান হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।

আশ্রমবাসী।

আশ্রম-সংবাদ।

পূজাবকাশ উপলক্ষ্যে ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ থাকিবে; ৪ঠা অগ্রহায়ণ হইতে পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

আশ্রমসম্মিলনী।

আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্রসকলকে লইয়া 'আশ্রম-সম্মিলনী' কয়েক মাস হইল গঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া এই সভা বসিয়াছে। আশ্রমসংক্রান্ত সকল বিষয় যাহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিতভাবে আলোচনা করেন এবং যাহা যাহা করণীয় তাহা স্থির করেন, এই সভা-প্রতিষ্ঠার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। আশ্রমে যত দিকে যতগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, এই সম্মিলনীকে তাহাদের সকলগুলির কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তুলিবার জন্য বিগত সভার পূর্ব্ব সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আশ্রম-সম্মিলনীর সাধারণ সভার সংশ্লিষ্ট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক প্রতিনিধি-সভা আছে, তাহার সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমকুটীর হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত নেপাল বাবু প্রস্তাব করেন যে আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের শাখা সভা গঠিত হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হন। গত সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এ প্রস্তাব সম্মিলনা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং স্থির হইয়াছে যে, মাসে একবার করিয়া সাধারণ সভা ও দুইবার করিয়া প্রতিনিধি-সভা বসিবে। আমরা একে একে বর্ত্তমান সময়ের আশ্রমের অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

(১) গ্রাম্য বিদ্যালয়।

আশ্রমের নিকটে যে সকল সাঁওতাল-পল্লী আছে, সেখানে কয়েকজন আশ্রম-বালক প্রত্যহ বৈকালে গিয়া সাঁওতাল-বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান সাত আট মাস যাবত চলিতেছে, এবং এই স্বল্প দিনের চেষ্টার ফলে কয়েকজন সাঁওতাল-বালক নিজের নাম এবং যুক্তাক্ষরহীন শব্দ লিখিতে শিখিয়াছে। ছবির পুস্তকের সাহায্যে তাহাদের বর্ণপরিচয় লাভ হইয়াছে। কথিত বাংলা ভাষা যাহাতে তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে নানা প্রকার গল্প

ব ৫৯ হয় এবং বাংলায় কথাবার্ত্তা বলাইবার চেষ্টা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের ভার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) সেবা-ভাণ্ডার।

আশ্রমে একটি সেবা-ভাণ্ডার আছে, ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ ঐ ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। আশ্রমে সময়ে সময়ে দরিদ্র অতিথি আসিলে এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হয়। এই দারিদ্র্য-ভাণ্ডার বর্ত্তমানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এই ভাণ্ডারের মাসিক আয় এখন গড়ে আট টাকার কাছাকাছি। দুইটি বিদ্যার্থী এই ভাণ্ডার হইতে প্রতি মাসে ৪॥০ টাকা হিসাবে অর্থ-সাহায্য পাইয়া থাকে। আমাদের আশ্রম হইতে অন্ধ, মূক, খঞ্জ ও রুগ্ন কখনো রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় না। চাউল, ছিন্নবস্ত্র ও যৎসামান্য অর্থ দিয়া আগন্তুক ভিখারীদিগকে সাহায্য করা হয়। দ্বিপ্রহরে বালকেরা কাঙ্গালিদিগকে ভোজনাবশেষ অন্ন ব্যঞ্জন নিজেদের হস্তে বিতরণ করিয়া থাকে।

(৩) ক্রীড়া বিভাগ।

আশ্রমের ছাত্রগণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সময়োপযোগী খেলা খেলিয়া থাকেন; আজকাল ফুটবল খেলা হইতেছে। পূজার ছুটির পর ক্রিকেট খেলা হইবে। আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি ফুটবল টীম আছে। এখানকার ছাত্রগণ সময় সময় পরস্পর এক একটি দল গঠিত করিয়া ম্যাচ খেলিয়া থাকেন। ১০ই ভাদ্র সুহৃদ কাপের (৺সুহৃদ কুমার সেন আশ্রমের একজন সাধুস্বভাব ছাত্র ছিলেন; বিগত ২১শে পৌষ অপরাহ্নে তাঁহার মৃত্যু ঘটে) ম্যাচ হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ বর্গের বালকগণ উক্ত কাপ্ এক বৎসরের জন্য জয় করিয়াছেন।

ক্রীড়াবিভাগের নায়কতা শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় করিয়া থাকেন।

(৪) সাহিত্য সভা।

আশ্রমের ছাত্রগণ সাহিত্য সভার-নিমিত্ত মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাহিত্য-সভার অধিবেশন করিয়া থাকেন। একটি সাহিত্য-সভা শিশুদের জন্য, এবং অপরটি বয়স্ক বালকদিগের জন্য। এই সাহিত্য-সভায় সঙ্কলন, মৌলিক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ প্রভৃতি বিবিধ ছাত্ররচনা পঠিত হয়। এ ছাড়া সঙ্গীত বক্তৃতা প্রভৃতিও হয়। তবে শিশু-সাহিত্য-সভায় অধিকাংশ সময় তর্কযুদ্ধ হয়। বিগত ১লা আশ্বিন তারিখে বড় ছেলেদের যে সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জনৈক ছাত্র রুষ-জাপান-যুদ্ধের একটি গল্প ও অন্য আর একজন ছাত্র একটি ইংরাজি হইতে অনূদিত গল্প পাঠ করেন। শিশুদের সাহিত্য-সভায় দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কযুদ্ধ করিয়াছিল। একদল অর্জ্জুনের পক্ষ, অন্য দল লক্ষ্মণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তর্কের বিষয় ছিল—অর্জ্জুন এবং লক্ষ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। অনেক তর্কের পর অবশেষে অর্জ্জুন পক্ষাবলম্বিগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

ইংরাজি সাহিত্য সভা।

মাঝে মাঝে ছাত্রগণ একটি ইংরাজী সাহিত্য-সভা অহ্বান করিয়া থাকেন। তাহাতে তর্কবিতর্ক, আবৃত্তি, ও ছোট খাট অভিনয় হইয়া থাকে। কখনো কখনো আমোদজনক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সকলও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(৫) পত্রিকা।

এখানকার ছাত্রগণ মাসে মাসে পাঁচটি বাংলা মাসিক পত্রিকা হাতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। পত্রিকাগুলির মধ্যে 'শান্তি' ও 'বীথিকা' বড় ছেলেদের উপযোগী। 'প্রভাত' এবং 'বাগান' মধ্যম বয়স্ক ছেলেরা বাহির করেন। 'শিশু' পত্রিকা শিশুদের জন্য। উল্লিখিত পত্রিকাগুলিতে গল্প, প্রবন্ধ, সঙ্কলন, কবিতা, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের ফল প্রভৃতি নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক পত্রিকাই ছাত্রগণ আপনাদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্রে শোভিত করিয়া বাহির করিয়া থাকেন।

(৬) বাগান।

আশ্রম-ছাত্রগণ আজকাল আশ্রমের পথ বাঁধানো, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। যাহাতে এক একদল ছাত্র এক একখণ্ড জমি লইয়া তাহাতে যত্নের সহিত শাক সব্‌জি রোপণ করিতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বাগানের ভার শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন।

গৃহের নামকরণ। আশ্রমের দক্ষিণ দিকের প্রান্তরে যে তিনটি নূতন ঘর হইয়াছে, তাহাদের নামকরণ আশ্রমের পরলোকগত তিনজন অধ্যাপকের নামে করা হইয়াছে। যথা—সত্য-কুটীর, মোহিত-কুটীর, সতীশ-কুটীর। এছাড়া, আর একটি ছোট ঘর আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ৺সরোজ চন্দ্র মজুমদারের নামে "সরোজ-কুটীর" নামে অভিহিত হইয়াছে।

ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

—॰—

আদিব্রাহ্মসমাজ।

সমাজ :—

২রা আশ্বিন বুধবার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৯ই আশ্বিন শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ, ১৬ই আশ্বিন শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এবং ২৩শে আশ্বিন শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করিবেন।

—॰—

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা :—

যে গৃহে মহাত্মা রামমোহন একদা ধর্ম্মপিপাসু কয়েকটী বন্ধু লইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বহুদেববাদী ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ-প্রচারের জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-পিতামহগণের স্মৃতি যে গৃহে জাগরুক, আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সেই পবিত্র দ্বিতল গৃহে মহাত্মা রামমোহনের মৃত্যুদিনে সকল সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণকে ব্রহ্মোপসনার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বহু জনসমাগম না হইলেও যে কয়েকজন উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারাই এই পুণ্যতীর্থে আমাদের মিলন সার্থক হইয়াছে। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজকে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা যেন না ভুলি। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন রামমোহনকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া গ্রহণ করি—তাহা হইলেই সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়া গিয়া আমাদের চিত্ত উদার উন্মুক্ত হইয়া উঠিবে, এবং যে অনুপ্রাণনায় একদা সকলে সমস্ত দেশকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমাদের দ্বারাও তাহা সম্ভব হইবে।

—॰—

তত্ত্ববোধিনী-সভা :—

মহাত্মা রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি বিধাতা কাহাকেও নির্দ্দেশ করিয়া না দিতেন, তবে রামমোহনের চেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হইত। কিন্তু ধর্ম্মের বীজ ত ব্যর্থ হইবার নহে। রামমোহনের ধর্ম্মউদ্দীপনা বালক দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল—তিনি এই যুবকের হাতে একেশ্বরবাদ-প্রচারের দায়িত্বভার ন্যস্ত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচারের নিমিত্ত ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্ট হইলেন এবং একটি সমিতি গঠন করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। আশ্চর্য্য এই যে, ৭টি মাত্র যুবক লইয়া এই সভা স্থাপিত হয়। ইহাদের উৎসাহে ছইবৎসর মধ্যে সভ্যসংখ্যা সাতশত হইয়াছিল। পাঠশালা স্থাপন করিয়া, পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ও আলোচনা বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য উদ্যোগ করা হইল। তখন তত্ত্ববোধিনী সভা বাংলা দেশে কি এক স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল—তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়। আবার কি তেমন জোয়ার আসিবে না? আবর্জ্জনা সকল স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়া সমাজের স্বাস্থ্যকে দূষিত করিয়া তুলিতেছে, সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনে আমাদের ধর্ম্ম যথার্থরূপে বিকশিত হইতে পারিতেছে না, আমাদের চেষ্টার মধ্যে প্রাণ নাই, ধর্ম্মের সহিত জীবনের যোগ নাই, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি,—আবার কি ধর্ম্মের বন্যা ব্রাহ্মসমাজকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে না?

আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের যে গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন হ[illegible]নে আবার সমস্ত একেশ্বরবাদিগণকে মিলিত করিয়া ধর্ম্মসাধনা ও প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইতে হই[illegible]—এই উদ্দেশ্য লইয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে পুনর্জাগ্রত করার চেষ্টা হইয়াছে। আগামী বারে সভার উদ্দেশ্য, [illegible]াবলী ও কার্য্যসূচী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভা স্থাপনে বি[illegible] উদ্[illegible]ী হইয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম অধিবেশনে তিনি সভাগৃহে "নব্যজগতে একেশ্বরবাদ" সম্ব[illegible] এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের একেশ্বরবাদিগণ আমাদের সহায় হউন—আমরা সম্মিলিত হইয়া দে[illegible]কেশ্বরবাদ প্রচার করি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—
আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়

"ধর্ম্মশিক্ষায়" উল্লিখিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয়—আশ্রমের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত। "ধর্ম্মশিক্ষার" সহিত ইহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। ৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য—।০ আনা মাত্র। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী।

১। **মাধ্যন্দিন-শতপথ ব্রাহ্মণ** (বহুটীকা সম্বলিত আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ) প্রথম খণ্ড ৩৲; দ্বিতীয় খণ্ড ২৸০।

২। **উপনিষৎসংগ্রহ** (মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড ।০ আনা; ২য় খণ্ড ।৶০ আনা।

৩। **মিলিন্দপ্রশ্ন** (মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ), ১ম খণ্ড ১৷০ আনা; ২য় খণ্ড ৸০ আনা।

৪। **পালিপ্রকাশ** (পালিভাষায় সম্পূর্ণ, ব্যাকরণ ও পালি পাঠাবলী একত্র) ২৸০ আনা, বাঁধান ৩৲ টাকা।

৫। **বিবাহ মঙ্গল** ।৶০ আনা!

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়!

অষ্টম বর্ষ! **ভারত-মহিলা।** অষ্টম বর্ষ!

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৷৶০ দুই টাকা দশ আনা। নমুনা ।০ চারি আনা।

বৈশাখ হইতে অষ্টম বর্ষ চলিতেছে।

বিগত সাত বৎসরে স্ত্রীপাঠোপযোগী মাসিক পত্রিকার মধ্যে ভারত-মহিলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা, সন্তান পালন, গৃহস্থালি প্রভৃতি বিষয়ক মহিলাদিগের অবশ্যপঠনীয় এবং নানাবিধ চিত্তাকর্ষক, কবিতা ও সুলেখকগণের চিন্তাপূর্ণ রচনায় কলেবর পুষ্ট করিয়া এবং সুন্দর সুন্দর চিত্রে শোভিত হইয়া প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত-মহিলা প্রকাশিত হয়। আশা করি, এবার বঙ্গের গৃহে গৃহে ভারত-মহিলা পঠিত হইবে।

অর্দ্ধমূল্যে পুরাতন ভারত-মহিলা।

১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের বাঁধান ভারত-মহিলা কিছুদিনের জন্য অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ২য় বর্ষ ফুরাইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বর্ষেরও [illegible] হইয়া আসিল। সত্বর পত্র লিখুন।

আরও সুবিধা—যিনি উক্ত পাঁচ ব[illegible]র ভারত-মহিলা এক সঙ্গে ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে মাত্র ৬৲ টাকাতেই সমস্তগুলি দেওয়া যাইবে।

৭ম বর্ষের বাঁধানো ভারত-মহিলা ২[illegible] আনা মাত্র।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ,
ভারত-মহিলা কার্য্যালয়, উয়ারী; ঢাকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮৩৩ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য হওয়া। *

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য ক'রে বিরাজ করচেন তাঁকেই একেবারে সহজে জান্‌ব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করচে এই কথাটি নিয়ে সে দিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি—তাঁকে জান্‌বার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে—এখানে তারই উল্লেখ করব।

মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে তাতে তাকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু তবু এই মুক্ত আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে চল্‌তে পারে না, বল্‌তে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার হৃদয়ে মনে যে সমস্ত শক্তি আছে, সে সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা ক'রে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে তবু অনেক দিন পর্য্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু জড়ত্বের এই সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করচে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকালের সত্য নয়। এখনো যদিচ সে চোখ বুজে কাটায় তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য, এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্ব্বে তার চেষ্টা এবং কষ্ট অল্প নয়। বারবার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে, বারবার সে ব্যর্থ হচ্চে। কিন্তু তার এই কষ্ট দেখে এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনই বলিনে যে তবে ওর আর কাজ নেই—ও থাক্‌ মায়ের কোলেই দিনরাত পড়ে থাক্‌। আমরা তাকে ধরে ধরে বারম্বার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেন না আমরা নিশ্চয় জানি এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্চিনে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্চি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি বলেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলাবলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে তার জন্যে এক মুহূর্ত্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে।

* শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্চে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করচে। জ্রণের মত সে কেবল নিচ্চে কেবল বাড়চে, আপনার প্রাণকে কেবল পোষণ করচে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলচে বলে জ্রণের মত আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে এ আর হতেই পারে না এখন সে কর্ত্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্চিনে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার, তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারচে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে এ কথা এখনো তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না—এখনো সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এম্‌নি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনো তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয়নি এই জন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এই জন্যেই শিশুর মতই সে সব জিনিষকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়; জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিষকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনো সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারচে না যে শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে, আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা দান করার দ্বারাই সে আপনাকে পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে;—সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্ভের মধ্যে নয়, সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই—আপনাকে নিঃসঙ্কোচে শেষ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্চে মানবজন্ম, এ কথাটাকে এখনো সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারচে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্ব্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে—মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা ব'লে স্থির করে।

কিন্তু শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েচে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করচে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মনে হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বস্তুত সে স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে—তেমনি মানুষের আত্মাসম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাইনে কেন তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয় রাজ্যের সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিষকেই মুখে প্রার্থনা করুক্‌, অন্য যে কোনো জিনিষের জন্যই শোক করুক্‌, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য, এবং তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্চে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্ত্তমান অক্ষমতাকে এমন বড় দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তাহলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্য্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্য্যের চেয়ে সত্য নয়—তেমনি স্বার্থবদ্ধ মানবাত্মার দুর্ব্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড় সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হোক না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহংএর চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল ক'রে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্চে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বদ্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না—বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এই জন্যেই তার এত বাধা—এবং তার এই সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

শিশু যখন চলতে গিয়ে পড়চে তখন যেমন তাকে বারম্বার পতনসত্ত্বেও চলার অভ্যাস করতে দেওয়া হয় কারণ সকলেই জানে পড়াটাই তার চরম নয়, সেইরকম প্রত্যহ সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে চলার অভ্যাস মানুষকে করতেই হবে। কোনো আলস্য কোনো ক্লেশে নিরস্ত হলে চল্‌বে না।

প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা এইটেই হচ্চে পন্থা। সংসারে যতই বাঁধা থাকি না কেন তবু সমস্ত খণ্ডতা, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে। বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়—প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো এক সময় স্বীকার করতেই হবে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য; ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতিদিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনো করতে পারচিনে—তবু মানুষকে একদিকে আকাশে মাথা তুলে এবং একদিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌তে হবে যে, সত্যজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য—প্রতিদিন বল্‌তে হবে—বিমুখ মনকেও বলাতে হবে, ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করচি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আস্‌বে। তখন অর্দ্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধূলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব; তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড় করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে; জানতে পারচিনে বলে সে শক্তিকে কখনই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে—বারবার তাঁকে বলতে হবে, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতিমুহূর্ত্তে, এই তুমি আমার অনন্তকালে। বল্‌তে বল্‌তে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজ্‌তে থাকবে, আমার মন বাজ্‌তে থাকবে, আমার বাহির বাজ্‌তে থাক্‌বে, আমার সংসার বাজ্‌তে থাক্‌বে। আমার চিত্ত বল্‌বে সত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বল্‌বে সত্যং। ক্রমে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেক কর্ম্ম বলতে থাক্‌বে সত্যং। বেহালা যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয়—তার কারণ, অনেক দিন থেকে সুর বাজ্‌তে বাজ্‌তে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেই রকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাক্‌তে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণু পরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠ্‌তে থাকে—যে বাজ্‌তে আর দেরি হয় না—কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্ম্মে, একতান আশ্চর্য্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠ্‌বে বলে বিশ্বমহাসভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে! সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্ পশুপক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করচে। বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করচে। এখনি তোমরা জেগে ওঠ, এখনি তোমরা তাঁকে ডাক—এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য্য শিউরে উঠ্‌তে থাক্‌বে, এই তোমাদের সাম্‌নেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠ্‌বে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ব জান্‌ব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসঙ্কোচে ঘোষণা করব, তুমিই সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুসলমান হিন্দু ও খৃষ্টান।

সম্প্রতি বল্‌কান্ দেশদিগের সঙ্গে তুরস্কের যে সংগ্রাম বাধিয়াছে, তাহার মূলকারণ যে ধর্ম্মগত বিদ্বেষ সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। খৃষ্টান্ মহাদেশে একজায়গায় যে মুসলমানশক্তির আধিপত্য আজিও বিরাজ করিতেছে, ইহা প্রবল খৃষ্টান্ জাতিসকলের পক্ষে লজ্জার বিষয়। তবে একেবারে তুরস্ককে গ্রাস করা কোন এক দেশের সাধ্যায়ত্ত ছিল না—সাধ্যায়ত্ত থাকিলেও তাহাতে ইউরোপীয় শক্তিদিগের 'ভারসামঞ্জস্য'

থাকে না—এই সকল নানা কারণে তুরস্ককে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে স্বীকার করা ও রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এ সকল কারণ সত্ত্বেও তাহার সাম্রাজ্যকে ক্রমশঃ ছাটিয়া-ছুঁটিয়া দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিবার দিকে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। যে বল্‌কান্ দেশসকল আজ তুরস্ককে তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল, তাহারাই একদা তুরস্কসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নব্য তুরস্কসম্প্রদায় সে দিন যখন বিপ্লব করিয়া তুরস্কের প্রাচীন শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, এবং খৃষ্টান প্রজাকুলকেও প্রজার সত্ত্বাধিকার দান করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল যে এই নব আন্দোলনে তুরস্করাজ্যের মুসলমান-খৃষ্টানের চির বিরোধ হয় ত আর থাকিবে না। প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তি ও প্রয়াসের দ্বারা তুরস্ক নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। পারস্যদেশে প্রতিনিধিত্বের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকালে পারস্য সম্বন্ধেও সেইরূপই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হইল কোথায়? তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদের স্বাধীনতার জন্যই বল্কান্‌গণ লড়িতেছে, তাহাদের এরূপ দৃপ্ত ঘোষণার কোন প্রতিবাদ কি খৃষ্টান প্রজারা করিয়াছে? এই যুদ্ধে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তুরস্কের যে ক্রমাগত হার হইয়াছে, তাহারও কতটা কারণ যে খৃষ্টান সৈন্যগণের ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতা তাহা কে জানে!

প্রজাতন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে আধুনিক যুগে আমাদের একটা মোহান্ধ সংস্কার আছে। বাহিরের যে সকল অবস্থার ও ভিতরের যে সকল কারণের যোগাযোগে কোন জাতির মধ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়,—ঠিক সেই সকল অবস্থা ও কারণের সমাবেশ কোনো নূতন দেশে প্রজাতন্ত্রের হঠাৎ আমদানীর সময়ে লক্ষ্য করা যায় কি না তাহা আমরা যাচাই করিয়া লইনা। এমন কি তাহাদেরই খুব সামান্য তারতম্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই একই প্রতিষ্ঠানের যে কত রূপরূপান্তর হইয়া পড়ে, তাহাও আমরা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি কি না সন্দেহ। যেমন ধর, ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের প্রজাতন্ত্রের শাসনপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কত বেশি—অথচ প্রজাতন্ত্র তো এই তিন দেশেই বিদ্যমান। এ যে এমন একটা বীজ যাহা ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে ভিন্নরূপ বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং হয় ত বা কোন মাটীতে একেবারেই মারা যায়—সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। সুতরাং পারস্যে বা তুরস্কে প্রজাতন্ত্রের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই কথা শুনিবামাত্রই আমরা মনে করি যে তবেই ঐ সকল দেশের সর্ব্বপ্রকার অধোগতি দূর হইবার সূত্রপাত হইল। ইহা চিন্তা করিয়া দেখি না যে তাহাদের ভিতরে ভিতরে কত বিচ্ছেদ ও কত বিরোধ রহিয়াছে, এবং কত জটিল সমস্যার জালে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া আছে।

তুরস্ক তাহার খৃষ্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহার শত্রুপক্ষের এই অপবাদ আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সে যে তাহার খৃষ্টান প্রজাদিগকে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া লইয়া এক কলেবরভুক্ত করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। ইউরোপে মুসলমান এবং খৃষ্টান স্পষ্টই মেলে নাই। খৃষ্টান মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে নাই এ কথা সত্য, কিন্তু মুসলমানই কি খৃষ্টানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়াছে? আজ না হয় সমস্ত ইউরোপের মধ্যে তুরস্ক নগণ্য শক্তি, কিন্তু একদিন যখন তাহার সাম্রাজ্য এই ইউরোপেই বহুবিস্তৃত ছিল এবং তাহারও পূর্ব্বে সুদূর স্পেনদেশ পর্য্যন্ত যখন মুসলমানশক্তি আপনার অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ইউরোপকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তখন খৃষ্টানকে গ্রহণ করিবার কল্পনাও কি তাহার মনের সুদূর দিক্‌প্রান্তে দেখা দিয়াছিল?

তুরস্কের কথাই ধরিতেছি কেন—ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান তুরস্কে মুসলমান ও খৃষ্টানের অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল একত্রে অবস্থান করিয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের যদি কোন সমস্যা আজ সকলের চেয়ে বড় হইয়া থাকে, তবে তাহা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সমস্যা। এক শাসনে এক সুখদুঃখে দীর্ঘকাল বাস করিলে দুই বিরুদ্ধ জাতির মিলন হইতে পারে, এ কথা যদি সত্য হইত তবে এ সমস্যার কোন সম্ভাবনাই ভারতবর্ষে ঘটিত না। অবশ্য বহুকাল একত্র থাকার জন্য এই দুই জাতির বাহ্য ঐক্যের সহস্র নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাহা দেখিয়া অনেকে মনে ভাবেন যে এ সমস্যাটি আমরা যতখানি গুরুতর বলিয়া কল্পনা করিতেছি, ইহা প্রকৃতপক্ষে তত গুরুতর নহে। কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া হাজারো মিল থাকিলেও, যদি মূলতঃ এমন কোন বৈষম্য থাকে যাহা কোন উপায়েই নিরাকৃত হইবার নয়, তবে তাহা মাথা জাগাইয়া উঠিবেই। ভিতরের গোপন ক্ষত বাহিরের পুষ্টচিক্কণ কলেবরকে ভেদ করিয়াই অবশেষে দেখা দিয়া থাকে—তখন ডাক্তারের নিদারুণ অস্ত্রাঘাত ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

মুসলমানে হিন্দুতে, মুসলমানে খৃষ্টানে একজায়গায় খুব মূলঘ্যাঁসা বৈষম্য আছে—যে জন্য সর্ব্বত্রই মুসলমান এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে যখন বলিতেছি, তখন এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না যে তবে বুঝি এ সম্বন্ধে হিন্দুর বা খৃষ্টানের কোন হাত নাই। দুই

হস্তের একত্র সংযোগ ভিন্ন যেমন তালি বাজে না, সেইরূপ যে সমস্যা দুই পক্ষের বিরোধ লইয়া সেখানে কোন পক্ষই নির্দ্দোষ বলিয়া সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে পারে না। আমরা যখন বলিয়া থাকি যে মুসলমানের সঙ্গে আর সকল বিষয়েই আমরা মিলিয়াছি, কেবল সামাজিক সম্বন্ধে মিলিতে পারি নাই—তখন সেই অমিলের জায়গাটাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আমরা একদিকে বলিব যে মুসলমানের সঙ্গে আমরা ভাবের দিক হইতে মিলি, এবং তাহার শাস্ত্রসাহিত্যের সত্য সকল গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই এবং অন্যদিকে তাহার সঙ্গে একত্র অন্নগ্রহণ বা জলপান করিব না, এবং তাহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অশুচিকর বলিয়া তাহাকে অবমাননা করিব—এমন অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের কি কোন সমর্থন আছে? মুসলমান ভাবকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মুসলমান মানুষকে শ্রদ্ধা করি না, এরূপ সৃষ্টিছাড়া হাস্যকর কথা বলিয়া যে আমরা অনেক সময় বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করি—ইহাই আশ্চর্য্য!

সুতরাং যে দিক দিয়া আমরা মুসলমানকে ক্রমাগত আঘাত করিয়াছি, সেই দিক দিয়া মিলনের পথে আমরা নিজের হাতেই কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিয়াছি এবং সমস্যাকে পাকাইয়া তুলিয়াছি, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

খৃষ্টানের মধ্যে আমাদের মত এমন অদ্ভুত অসামঞ্জস্য নাই বটে কিন্তু সে মুসলমান ধর্ম্ম ও সাধনার প্রতি কোন দিনই শ্রদ্ধাশীল নহে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদকেই অধিকাংশ খৃষ্টান লেখক 'শঠ' ও 'প্রবঞ্চক' প্রভৃতি শব্দ ছাড়া সম্মান প্রদর্শন করিবার অন্য শব্দই খুঁজিয়া পান নাই। ভিন্নধর্ম্মী মহাপুরুষের প্রতি এমন সুগভীর অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না।

মুসলমানের সঙ্গে বিরোধে হিন্দু ও খৃষ্টান উভয়ের দোষ কবুল করিয়া লইলাম। কিন্তু হিন্দু ও খৃষ্টানের মেলেনা কোথায় তাহা যেমন দেখা গেল সেইরূপ মুসলমানের কোথায় মেলে না তাহাও ভাল করিয়া জানা দরকার। সে যে কেবল হিন্দুর পক্ষেই জানা দরকার তাহা নহে, মুসলমানের পক্ষেও জানা দরকার। কারণ খৃষ্টান-মুসলমান সমস্যা অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গুরুতর। ইউরোপ মুসলমানকে এসিয়ার প্রান্তদেশে কোনদিন তাড়া করিয়া রাখিয়া আসিতেও পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই—তাহাদের বিচ্ছেদ কদাপি সম্ভবে না।

তা ছাড়া, ভারতবর্ষে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ নানা সূত্রে বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। এই সেদিনও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের পিতামহ প্রপিতামহগণ আরবী ও পারসী ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিতেন এবং মুসলমান শাস্ত্রসাহিত্যের রসগ্রহণ করিতেন। মধ্য যুগে নানক, কবীর, দাদূ, চৈতন্য, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে ও প্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্মের যে প্রবল প্লাবন বহিয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্মের কাছেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণ স্বীকার করিবার ছিল। নানক, কবীর প্রভৃতি সকলেই জাতিকুলের বেড়ি ভাঙিয়াছেন, বাহ্য আচার ও ক্রিয়াকলাপের অসারতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং যে-কোন মানুষ কেবল মাত্র বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই যে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে এই কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। এই সকল কথা বলার মধ্যে যে সুস্পষ্ট সমাজ-বিদ্রোহ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মূল কারণ মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব ছাড়া আর কি হইতে পারে? আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের চাষী, মজুর, মাঝি, জোলা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা জাতিতে হিন্দু হইলেও এক সময়ে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেইজন্য আজি পর্য্যন্ত তাহারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার এমন কি পূজাপদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তার মানে যে ভয়ঙ্কর অবমাননার ভার সমস্ত সমাজ তাহাদের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কাল কাটাইতেছিল, ভিতরে ভিতরে একজায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার একটা গোপন চেষ্টা ছিলই—মুসলমানধর্ম্ম আসিতেই সেই চেষ্টা আপনাকে সহসা প্রকাশ করিয়া বসিল। কবীর, নানক প্রভৃতির নিকটেও সেই সমাজবন্ধন হইতেই মুক্তির মন্ত্র ছিল—সেইজন্য তাঁহারা এই নিম্ন শ্রেণীয়গণকে সমাজ হইতে ছিনাইয়া লইয়া এক প্রবল সম্প্রদায়রূপে দাঁড় করাইয়াছিলেন, যাহাদিগকে ভবিষ্যতে সমাজ স্বীকার না করিয়া পারে নাই। এইরূপে শুধু ধর্ম্মে নয়,—সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাষায়, আচারব্যবহারে—কত জায়গায় যে মুসলমানের প্রভাব হিন্দুচিত্তের উপর ভারতবর্ষে কাজ করিয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বাংলা ভাষার মধ্যে পারসী ও উর্দ্দু শব্দ কত প্রবেশ করিয়াছে। বাউল সম্প্রদায়ের যে সকল গান প্রচলিত আছে, তাহা সুফীধর্ম্মের ও সাধনার দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত। কবীর প্রভৃতির রচনা ও সঙ্গীতের তো কথাই নাই—তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাধনার সম্মিলনে সৃষ্ট হইয়া এক অপূর্ব্ব জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমে মুসলমান রাজধানী বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিবার জন্য সেখানকার হিন্দুগণ মুসলমান আদবকায়দায় পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত হইয়াছেন। এদেশের শিল্পেও আকবর সাহজাহান প্রভৃতি

সম্রাটদিগের রাজত্বকালে হিন্দু-শিল্পের সঙ্গে স্যারাসেন ও মোগল-শিল্প প্রচুররূপে মিশিয়া গিয়াছে।

এতগুলি মিলনের সূত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য ঘটে নাই কেন তাহাই ভাবিবার বিষয়। হিন্দু, মুসলমানের ধর্ম্মের ও সাহিত্যশিল্পের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আবিষ্কার করিয়াছে এবং আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু মুসলমান এত বড় প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নিকট হইতে কি লাভ করিল? গজনীর সুলতান মহমুদ হইতে আরম্ভ করিয়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মুসলমানের কর্ত্তৃক হিন্দুদেবদেবীর নিগ্রহের ইতিহাসই আমরা দেখিতে পাই—কিন্তু হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞান, হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনা যে মুসলমানধর্ম্মে কোন আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে এমন কথা তো শুনিতে পাই না। একমাত্র মহামতি আকবরের নাম করিয়া মুসলমানগণ এ অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারে বটে, কিন্তু আকবর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য উদ্যোগী হইয়া মুসলমান ধর্ম্মকে ও আচারকে প্রবলরূপে আঘাত করিয়াছিলেন। মুসলমান যে দেশেই গিয়া বাস করুক তাহার আরবীয়ত্ব কোনমতে ঘুচিতে চায় না। খাদ্য পরিচ্ছদে আচার-ব্যবহারে সকলবিষয়ে সে সেই মোহম্মদের সময়কার আরবের ধরণ-ধারণ অবলম্বন করে। নমাজের সময় সে পশ্চিমমুখীন্ হইয়া নমাজ পড়ে—মনে মনে আপনাকে মক্কায় লইয়া না গেলে তাহার উপাসনা পূর্ণ হয় না। এইজন্য মুসলমানের পক্ষে কোন দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এত কঠিন। তাহার স্বদেশ নাই, তাহার শুধুই ইস্লাম আছে। আকবর এ সকল আরবীয়ত্ব ও মুসলমানীত্ব একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার রুচি ও কল্পনা এমনি সুতীক্ষ ছিল যে হিন্দুর পূজাপদ্ধতি ও আচার রীতিনীতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল—তিনি কোনমতেই আপনার স্বজাতীয়ের মত আপনাকে একরোখা করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেন না। তাঁহার মস্জিদে রং চং চাই—দেয়ালে কারুকার্য্য চাই—মরুভূমির নিরাবরণ নীলাকাশের অনুকারী বৃহৎ গুম্বজ ও আলোকপ্রচুর অনাবৃত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের পাণ্ডুর শুভ্রতা তাঁহার কল্পনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এইজন্য শেষাশেষি আকবরকে মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'দিহিন্ ইলাহি' সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আকবরকে গণনার মধ্যে না ধরাই ভাল, কারণ তিনি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই অধিক ছিলেন। তিনি মুসলমানজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হইতেই পারেন না।

তুরস্কে যদি খৃষ্টান ও মুসলমান না মিশিয়া থাকে তবে তাহা তত আক্ষেপের নয়। তুরস্কের রাজত্বের ইতিহাস সাড়ে চারিশত বৎসর মাত্র; তা ছাড়া তুরস্ক যেখানে রাজত্ব করিতেছে সেখানে ইউরোপীয় সভ্যতাই প্রবল, সুতরাং খৃষ্টানধর্ম্মেরই ষোলআনা আধিপত্য। অবশ্য এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে ইউরোপে তুরস্কের রাজত্বের পূর্ব্বে মুসলমানশক্তিই এক সময়ে পুরাতন গ্রীক ও রোমান জ্ঞানের বাতিকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের অন্ধকার যুগে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়াছে এবং পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডারের নানা সঞ্চয় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কিরা কন্‌স্টান্টিনোপল্ অধিকার করে—তাহার পর হইতেই বাস্তবিক ইউরোপীয় রেনেসাঁস অর্থাৎ বিজ্ঞানময় যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল স্থানে সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, সেই সেই জায়গায় মুসলমান যে কতটা রস সিঞ্চন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজিও কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভাল করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরেন নাই। অবশ্য তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রবল ইউরোপীয় সভ্যতার নিকটে মুসলমানকে নিষ্প্রভ ও নির্জ্জীব হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে কোনদিনই মুসলমানের এরূপ নিষ্প্রভ হইবার কারণ ছিল না। তবে ভারতবর্ষে ফৈজি, আবুল ফজল্, দারা প্রভৃতি দুচারজন মুসলমান জ্ঞানী ব্যতীত এমন অনেক পণ্ডিত ও রসজ্ঞ কেন দেখা যায় নাই যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রসাহিত্যের সমস্ত সম্পদ্ আপনাদের স্বজাতির জন্য আহরণ করিবার নিমিত্ত চিরজীবন সাধনা করিয়াছেন? এত যুগ ধরিয়া পাশাপাশি থাকিয়াও এমন বিমুখতা! সাত সমুদ্রের পার হইতে বিদেশী আসিয়া যে সভ্যতার সুগভীর খনি হইতে কত রত্নরাজি খনন করিয়া লইয়া গেল—তাহা দেখিয়াও কেন ইচ্ছা হইল না যে সেই খনির মধ্যে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করি! এমন একান্ত বিমুখতা কেন?

সেইজন্য এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে মুসলমান যে পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই অন্য সভ্যতার সারভাগ গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ আপনাকে বিচিত্র ও বৃহৎ করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহার ভিতরকার কারণ তাহার ধর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে। তাহার ধর্ম্ম তাহার সমস্ত সভ্যতার বিচিত্র শক্তির মূল প্রস্রবণস্বরূপ হয় নাই। সে ধর্ম্মের মধ্যে অভিব্যক্তির যে স্তরপর্য্যায় নাই এ কথা আমি বলিনা, কিন্তু মোটের উপর তাহার আসল ভাব অবিকৃতই থাকিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সভ্যতার সংস্পর্শে সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার ধর্ম্মকে নব নব বিকাশের পথে ধাবিত করে নাই। মুসলমান—চীন, হিন্দু, পারস্য ও গ্রীক এই চারি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। চীনের প্রভাব হয়ত মোগল

শিল্পকলার উপর কিছু পড়িয়াছে, হিন্দুর প্রভাবও সেই-রূপ, পারস্যের প্রভাব সকলের চেয়ে অধিক—কারণ বোগ্‌দাদে খালিফ্‌দিগের সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল থাকায় পারস্যের প্রভাবে শিল্পসাহিত্যের এক আশ্চর্য্য বিকাশ মুসলমানের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। গ্রীক প্রভাবে—নিও প্লেটনিক তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইয়া সুফীধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম্মে ভক্ত সাধক ও কবি অনেক সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও পারস্যদেশ হইতেই আধুনিক বাবী ও বাহাই প্রভৃতি নূতন ধর্ম্ম সকল জাগিতেছে। কিন্তু এ সকল কথা মানিলেও এত বড় একটা ধর্ম্ম এতগুলি বড় বড় সভ্যতার স্পর্শে যে এত অল্পই আন্দোলন ও বিচিত্রতা উৎপাদন করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নয় কি?

আমার এ কথায় মুসলমান ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ বা অনুদার বলা হইতেছে বা অন্য কোন ধর্ম্মের তুলনায় খর্ব্ব করা হইতেছে এরূপ ধারণা পাঠকের মনে জন্মিবার আশঙ্কা আছে। জগতের প্রত্যেক বড় ধর্ম্মেরই যে বিশেষ একটি সার্থকতা আছে যাহা আর কোন ধর্ম্মের নাই, একথা আমি খুবই মানি। মুসলমান ধর্ম্ম মানুষকে যে জিনিসটি দিয়াছে, তাহা আর কোন ধর্ম্মই দিতে পারে নাই—কারণ তাহা হইলে মুসলমান ধর্ম্মের কোন স্থানই থাকিত না। কিন্তু সে যাহা এক সময়ে দিয়াছে তাহাতেই যে সে চুকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারে, এমন কথা মনে করিতে পারি না। কারণ মানুষের এক সময়ের যাহা প্রয়োজন, অন্য সময়েরতো তাহা নয়। অথচ মানুষের চিরন্তন কালের প্রয়োজন ধর্ম্মকে মিটাইতে হইবে, সুতরাং কালে কালে তাহাকে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতেই হয়—সে এক জায়গায় অচল হইয়া পাথরের মত বসিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি তাহার মধ্যে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই? অবশ্যই আছে,—কারণ ধর্ম্ম নিত্য বই আর কি—কিন্তু সে মৃত নিত্য নহে, তাহার নিত্যতা সচল এবং জীবন্ময়। সকল অনিত্যতাকে আপনার পাশে বাঁধিয়া রাখিবার—সমস্ত জীবনের সকল প্রকার বিচিত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইবার শক্তি দ্বারাই ধর্ম্মের যথার্থ নিত্যতার ও গভীরতার পরিমাপ হয়। নহিলে সে যে নিত্য তাহা জানিবার উপায় কি? এখন প্রশ্ন এই যে মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে, সমস্ত জীবনের সকল প্রকার বিচিত্রতাকে আয়ত্ত করিয়া লইবার মত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা। সে যখন আজও পর্য্যন্ত মানুষের জীবনের মধ্যে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তখন কিছু না কিছু পরিমাণে সে শক্তি তাহার আছেই। তবে আমার বক্তব্য এই যে খুব সম্ভব এত অধিক পরিমাণে নাই যাহাতে সে মুসলমান সভ্যতাকে বিশ্বমানবের নানা ভাবের ও রসের মধ্য দিয়া সরস ও বিচিত্র করিয়া লইয়া তাহাকে সকল দিকে একটি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা দান করিতে পারে। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই একলা এত বড় কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। খৃষ্টান ধর্ম্ম যদি বলে, সে পারে—তবে সে কথা মিথ্যা বলা হইবে—কারণ খৃষ্টান ধর্ম্ম কত ধর্ম্ম হইতে যে পুষ্টি-সংগ্রহ করিয়া তবে এই কাজে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহা হিসাব করিয়া বলা শক্ত। আমাদের দেশেরও কোন ধর্ম্মই এত বড় কথা বলিতে পারে না—কারণ আধুনিক কালে আমাদের দেশের কত বিচিত্র ধর্ম্মমতের বিশেষ ভাবে আলোচনা চলিতেছে, বিদেশের ধর্ম্মও আমাদের চিত্তকে কত রকমে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি বা নব্য হিন্দু ধর্ম্ম বলি, যে ধর্ম্মেরই নাম করি—তাহা যে কত জায়গা হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়াছে তাহা বলা শক্ত। অতএব কেবল মুসলমান ধর্ম্মই একাকী সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এ যুগের মানুষের সমস্ত জীবনের কেন্দ্রস্থানটি অধিকার করিয়া লইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

খৃষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের একটুখানি তুলনা করিলেই আমার বক্তব্য কথাটি পরিষ্কার হইবে।

যদিচ ইহুদী এবং আরব ইহারা উভয়ই সেমিটিক্ জাতি এবং মরুভূমি ও অনুর্ব্বর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে পশু-চারণ করিয়া গোষ্ঠী বাঁধিয়া ইহাদের বাস, তথাপি এই দুই জাতি হইতে যে দুই ধর্ম্ম জাগিয়াছে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য যথেষ্ট দেখা যায়। তাহার একটা কারণ এই যে ইহুদিগণ প্রাচীন মিশরের সভ্যতার অনেক ভাল জিনিস আত্মসাৎ করিয়াছিল—সুতরাং একমাত্র মরুভূমিই তাহাদের ধর্ম্মের জনক ছিল না। যাহাই হউক, প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্ম এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম উভয়ই একেশ্বরবাদী এবং উভয়ই ঈশ্বরকে স্বর্গলোকে বিধাতারূপে (Providence) নির্দ্দেশ করিয়াছে। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের শাস্তা। ঈশ্বরের এই বিধাতৃত্বের ধারণা হইতে উভয় ধর্ম্মেই নীতি খুব বড় স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্ম যিশুখৃষ্টের ভিতর দিয়া ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মনৈতিক স্তর হইতে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ভগবান যে মানুষের পরিত্রাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করিলেন,—কেবলমাত্র এই কথাটি ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের দূরত্ব একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে—তাঁহাকে পিতা, বন্ধু, স্বামী এবং পরম আত্মীয় করিয়া নিকটে আনিয়া দিয়াছে। তিনি যে শুধু নিয়ম-দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, তিনি যে শুধু বিচার করিয়া পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা নহে—তিনি ক্ষমা করিয়া সকল পাপভার মোচন করিতেছেন।

ইহুদী ধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মের এই একটি মস্ত জায়গায় প্রভেদ।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে খৃষ্টকে মহাপুরুষ স্বীকার করে বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করে না। কোরাণে উক্ত হইয়াছে "ইহা কোন মানুষকে সাজে না যে ঈশ্বর তাহাকেই কেবল শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি দিয়া দিবেন এবং সেই মানুষ তাহার অনুচরবর্গকে এই কথা বলিবে যে তোমরা ঈশ্বরকে এবং আমাকে উভয়কে ভজনা কর—বরং তাহার এই কথাই বলা উচিত যে তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সকল বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ কর।" * আবার এক স্থানে আছে "কেহ কেহ বলেন যে ভগবান মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। একি দুঃখের কথা—কি অন্যায় কথা! ঈশ্বরের পুত্র হইবে ইহা কি হইতে পারে! স্বর্গে মর্ত্ত্যে যে কেহ আছে সকলেই তাঁহার ভৃত্য ও সেবক, আর সেই ভাবেই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবে।" † "তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর—তিনি ভিন্ন আর কোন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই—পৃথিবীতে বা স্বর্গে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহার। তিনি জন্ম দেন্‌না বা জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাঁহার স্বরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।" ‡

তারপর মধ্যবর্ত্তীবাদও ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্বীকার করে না। খৃষ্ট যে আসিয়া মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলন ঘটাইতেছেন এবং মানুষের অপরাধ মোচন করিয়া দিতেছেন—এ ভাবেরও সে ভয়ানক বিরোধী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগের মধ্যস্থতা কোন মানুষ করিবে, ইহা কি সম্ভব? তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে তিনি যে আপনিই মানব হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন। মুসলমান ধর্ম্মে মোহম্মদ প্রেরিত পুরুষ বটেন, কিন্তু তিনি মধ্যবর্ত্তী নহেন। তিনি যে মানুষ একথা কোন মুসলমান ভক্ত কোনদিন বিস্মৃত হয় নাই। যিশু খৃষ্ট ও প্রাচীন হিব্রু ঋষিগণকে মুসলমানেরা সেইরূপ উন্নত ও মহৎ মানুষ বলিয়াই সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছে।

কোরাণের এই সকল কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বাইবেলের Higher criticism অর্থাৎ তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার মত শুনাইতেছে। সেই সমালোচনার কঠিন বিচারে বাইবেলের অনেক তত্ত্ব নানাজাতির সংস্পর্শ হইতে প্রাপ্ত সংস্কার মাত্র বলিয়া আজকাল প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি খৃষ্টের জীবনচরিত সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতদ্বৈধের অন্ত নাই। তাঁহারা বলেন যে তাহাও কত লোকের মুখে মুখে কত দেশদেশান্তরে নানা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। অতএব খৃষ্টধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব কোরাণ মানেন নাই তাহাদের ইতিহাস অতীত কালের বিচিত্র স্তরপর্য্যায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। বাইবেলকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনার দ্বারা তাহার কতক কতক কেবল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনার দ্বারা কি খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তি ভাঙিয়া যাইতেছে? প্রথমে তাহাই মনে করিয়া ধার্ম্মিক লোকের চিত্ত আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে খৃষ্টধর্ম্ম যে নানা জাতির নানা কালের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়া যাত্রা করিয়াছে, সে যে নিত্য নূতনরূপে মানবের চিত্তলোকে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রাণের গৌরব। সুতরাং তাহার মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা অতীত কালের আবর্জ্জনা, যাহা অন্ধসংস্কার বশতই মানুষ আজও পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টের জীবনের যে একটি দিব্যত্ব—তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের যে একটি পরমপ্রেমের প্রকাশ—এই ধর্ম্মের নিত্যস্বরূপ হইয়া আছে, নানা কালের জঞ্জালের সঙ্গে তাহাকে তো ঝেঁটাইয়া ফেলা যায় না? একদিকে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিয়মরূপ, অন্যদিকে তাঁহার মানুষের প্রতি একান্ত প্রেম ও লীলারূপ—এই দুই দিকের যে আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য খৃষ্টধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আধুনিক কালের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, এবং কোন কালেই তাহার প্রয়োজনের অবসান হইবে না। এই একের দিক্‌ এবং বিচিত্রের দিক্‌, অসীমতার দিক্‌ এবং সীমার দিক্‌, পূর্ণতার দিক্‌ এবং অপূর্ণতার দিক্‌, ঈশ্বরের দিক্‌ এবং মানুষের দিক্‌—যে ধর্ম্মে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে নাই, তাহা কখনই মানুষের সকল শক্তির মধ্যে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মানুষের জীবনকে ও ইতিহাসকে নবগতি ও নববৈচিত্র্য দান করিতে সমর্থ হয় না।

মুসলমানধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসে কি এই উভয় দিকের সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে? সে কি মানুষের সমস্ত জীবনের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া জীবনের সকল বিচিত্র শক্তিকে আপনার পরম ঐক্য পরম রসের দ্বারা এক করিয়া এবং বড় করিয়া তুলিতেছে?

বর্ত্তমান যুগে কোন ধর্ম্মই আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে না। বাষ্প এবং বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন আজ সমস্ত পৃথিবীকে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ ধর্ম্মের এক প্রবল বৈদ্যুতশক্তি

* স্থরা—৭

† স্থরা (১১)—৯১-৯৪।

‡ স্থরা (২)—১৫৮-১৬০।

প্রত্যেক দেশকে আলোড়িত করিতেছে এবং এক স্থানের কম্পনকে অন্য স্থানে বহন করিয়া আনিতেছে। বাহির হইতে দেখিতে গেলে এ যুগের মত এমন বিরোধের যুগ আর হয় নাই—রাজার সঙ্গে প্রজার, ধনীর সঙ্গে শ্রমীর, সভ্যের সঙ্গে অসভ্যের, পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমের, ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধের বিচিত্র তরঙ্গের উত্তাল নর্ত্তনে সমস্ত বিশ্বমানবসমুদ্র অহরহ সংক্ষুব্ধ। কিন্তু শুধু তরঙ্গই গণনা করিয়া যাইব—যে প্রবল স্রোত নিয়ত এই মহাসমুদ্রের অন্তরদেশে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে এরূপ উতলা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইব না? সে স্রোত ধর্ম্মের স্রোত—তাহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বিশিষ্ট ধর্ম্মকে বিশ্বধর্ম্ম করিবার জন্য এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা সভ্যতার সমস্ত বিরোধ ও দলাদলিকে, সকল বিচিত্র শক্তিসমূহকে ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য শতদলের মধ্যে বিকশিত করিয়া দিবে। সমস্তকেই বাঁধিবে বলিয়া তাহার নাম রিলিজন্, সমস্তই ধারণ করিবে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম্ম। মুসলমানধর্ম্ম কেমন করিয়া এই বৃহৎ সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? এই যুগই তাহাকে জাগাইয়াছে, এই যুগই সহস্র অকৃতার্থতার মধ্য দিয়াও তাহাকে সফলতার দিকে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ করিতে থাকিবে। এই যুগ মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টান এই ত্রিধারাকে মিলাইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমেরিকার ঘরের কথা।

গার্হস্থ্য জীবন বলিতে আমাদের মনে যে একটি বিরামপূর্ণ শান্তিময় কল্যাণচ্ছবি জাগিয়া উঠে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সাধারণতঃ সেইটী দেখিতে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ যে কর্ম্ম-স্রোতের খরতর বেগে সমগ্র জাতিটা সম্পূর্ণভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। কর্ম্ম ইহাদের গৃহকে নানাপ্রকার স্বচ্ছন্দতায়, আরামে, বিলাসসামগ্রীতে পূর্ণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের মনে তৃপ্তি আনিয়া দিতে পারে নাই।

তৃপ্তি হইবেই বা কি করিয়া? প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মতালিকা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মনে হয় ইহারা কোন্ এক অসাধ্য বাসনার চরিতার্থতার জন্য নিরন্তর ছুটিয়া মরিতেছে, যেন, যে করিয়াই হোক্ সংসারকে পাইতে হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে, ইহারা এমন পণ করিয়া বসিয়াছে। ইহার ফলে একদিকে এই চেষ্টা যেমন ইহাদের জীবনের একটা অংশ খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে, অপরদিকে সংসারকেই একান্তভাবে গড়িয়া তুলিবার যত কিছু সাজ সরঞ্জামে ইহাদের গৃহ ভরিয়া উঠিতেছে মাত্র; সংসারকে তবুও ধরিতে পারিতেছে না।

আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে আমেরিকার ঘরের একখানি ছবি দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিব। প্রভাতে গৃহকর্ত্রীর সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাইবার আয়োজন করা। প্রাতরাশের পর গৃহকর্ত্রী নিজে ছেলেমেয়েকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরাইয়া, বই খাতা ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়া, যাহাদের বাড়ী স্কুল হইতে দূরে তাহাদের মধ্যাহ্নের আহারের জন্য দু চারটা স্যাণ্ডুয়িচ ও কিছু মিষ্টান্ন একটী ছোট্ট টুক্‌রিতে সাজাইয়া দিয়া স্কুলে রওনা করিয়া দেন। শিশুকাল হইতেই ছেলেমেয়েরা বিদায়কালীন ইঙ্গিত সম্ভাষণ যথা চুম্বন, রুমাল উড়ান, অথবা হাত নাড়া ইত্যাদি, করিতে শেখে। বাড়ীর সিঁড়ির উপর মা দাঁড়াইয়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাত্রা করাইয়া দেন—শিশুরা একে একে মায়ের গলা ধরিয়া চুম্বন করিয়া মায়ের আদর লাভ করিয়া কলরব করিতে করিতে স্কুলের দিকে ছুটিয়া যায়। সকালবেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় সহরের ফুটপাথ্ দিয়া দল বাঁধিয়া এক এক পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলের দিকে ছুটিয়াছে; সকলের হাতেই স্কুলের ব্যাগ, কাহারো হাতে খাবারের টুক্‌রি, কেহ কেহ বা এক একটা স্যান্‌ডউইচ খাইতে খাইতে রাস্তায় প্রাতরাশ শেষ করিতেছে। এই ছোট ছোট ইয়াঙ্কির দল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে সজ্জিত হইয়া নানারংয়ের ছোট ছোট ছাতি খুলিয়া উৎসাহের সঙ্গে কলরব করিতে করিতে যখন স্কুলের দিকে যাত্রা করে তখন মনে হয় "Creeping like Snails unwilling to School" এই বর্ণনাটি বর্ত্তমান যুগে অন্তত এই বাচ্চা ইয়াঙ্কিদের সম্বন্ধে খাটে না।

ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার উপর আমেরিকান জননীর বিশেষ দৃষ্টি, সেইজন্য অবস্থা যেমনই হোক্ না কেন, ছেলে মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। একজন জাপানী সম্পাদক কিছুকাল পূর্ব্বে নিউইয়র্কের পূর্ব্বাংশে অধিকাংশ দরিদ্র গৃহস্থ পল্লীর কাছে এক স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ পরিদর্শনান্তে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে আর্থিক অভাবেই স্কুলের কাজ আশানুরূপ হইতেছে না। নিউইয়র্ক সহরকে এই প্রকার অন্তত দুইশত বিনাবেতনের বিদ্যালয় পোষণ করিতে হয়।" শুনিয়া জাপানী ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

উঠিলেন এবং বলিলেন "অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে তথাপি বেতন লওয়া হয় না কেন, এবং কেনইবা স্কুলের যথেষ্ট আয় হয় না।" অধ্যক্ষ একটু হাসিয়া সম্পাদককে নিকটবর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একটী ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা একজন স্ত্রীলোক তাহার কন্যার দ্বিপ্রহরের খাবার লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন "এই স্কুলে যত ছাত্রছাত্রী আছেন অধিকাংশই নিতান্ত গরীবের ঘরের। ঐ মেয়েটীর মা সপ্তাহে দুই ডলারের বেশি আয় করিতে পারেন না।"

আমেরিকার বিশিষ্ট ধনীর শিশুসন্তান ব্যতীত সকলেই ফ্রী স্কুলে যায় এবং শিশুকাল হইতেই ছেলেমেয়ে একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে বাল্যকাল হইতেই ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়াই আমেরিকার যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিধান প্রচলিত আছে সেখানে সাংঘাতিক কোনো কুফল ফলিতে পারিতেছে না।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলিয়া গেলে গৃহকর্ত্রী স্বামীর সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ শেষ করিয়া ঘরের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এদিকে কর্ত্তা তাড়াতাড়ি সকাল বেলার সংবাদ পত্রের উপর চোখ বুলাইয়া সমস্ত দিনের মতন বাহিরে চলিয়া যান। অবস্থা একটু সচ্ছল না হইলে আমেরিকায় কেহ ঝি চাকর রাখেন না। এই জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীকে সমস্ত কাজই নিজের হাতে করিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে কোমর বাঁধিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করা ইহাদের এমন সহজ বোধ হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমেরিকানদের গৃহ হইতে সামান্য মুদি দোকান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কর্ম্মের এমন একটা শৃঙ্খলা আছে, যে কোথাও কোনো অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কারণে সিকাগোর এক একটী Department Store এ আট দশ হাজার স্ত্রীপুরুষ কলের মতন খাটিতে পারে, যে কারণে নিউইয়র্ক ষ্টক্ এক্সচেইঞ্জে (Stock exchange) কোটি কোটি টাকার আদান প্রদান হইতেছে, অথচ কোনো গোলযোগ নাই, কোথাও কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতে পারে না, সেই কারণেই আমেরিকার গৃহে সমস্ত দৈনিক কাজকর্ম্ম বিনা ব্যাঘাতে সম্পাদিত হয়, এবং গৃহকর্ত্রীও ইহাতে ক্লান্তি অনুভব করেন না। সুশৃঙ্খলতা ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনের একটা প্রধান মন্ত্র। অবশ্য, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থায় এবং টেলিফোন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদির সাহায্যে ঘরের কাজকর্ম্ম খুবই সহজ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতে টেলিফোনে মুদিকে মাংসওয়ালাকে, রুটীবিক্রেতাকে, আবশ্যক জিনিষপত্রের জন্য যেমন আদেশ করা যায় অমনি তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া থাকে। সপ্তাহের অথবা মাসের শেষে বিল লইয়া আসিলে দাম চুকাইয়া দিতে হয়—আর কোনো হাঙ্গামা নাই। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা ও কার্পেটের ধুলা ঝাড়া, ঝাঁটাযন্ত্রের (Vacuum cleaner) সাহায্যে অল্প সময় ও পরিশ্রমেই হইয়া যায়। রান্না ঘরের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত অতি চমৎকার সেইজন্য আমাদের দেশে গৃহিণীদের মতন দিনের অধিকাংশ কাল ইহাদিগকে রান্না আয়োজনেই কাটাইতে হয় না। দুপ্রহরের ভোজনাদির বিশেষ কোনো উদ্যোগ আবশ্যক হয় না—স্বামী তাহার কর্ম্মস্থলের নিকটবর্ত্তী কোনো দ্রুত জলখাবারের দোকানে (Quick Lunch restaurant) কিছু খাইবেন, পুত্রকন্যারা ত খাবার সঙ্গে করিয়াই গিয়াছে। সন্ধ্যার পর পিতামাতা ভাইবোন লইয়া যে ভোজনটি হয়, সেইটি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে উপাদেয় ও প্রীতিকর হয়, গৃহিণী সেইজন্য বিশেষ আয়োজন করেন। সমস্ত দিন এইভাবে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম্ম লইয়া গৃহিণীকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট কাজ ছাড়া, সপ্তাহে একদিন বিছানার চাদর, রুমাল, তোয়ালে, ছেলেমেয়েদের কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করা একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। সোমবারদিনকে ইহারা কাপড় কাচার দিন (Laundry day) বলে। ধোপার খরচ আমেরিকায় অত্যন্ত বেশি—তাই জামা, কলার ও উৎকৃষ্ট কোনো পরিধেয় ব্যতীত সমস্তই গৃহিণী নিজেই পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করেন। এত সব ঘরকন্নার কাজ করিয়াও দৈনিক সংবাদ পত্রটি, মাসিক পত্রিকা দুই একটা, অথবা নব প্রকাশিত কোনো গল্পের বই গৃহকর্ত্রীর মনোযোগ এড়াইতে পারে না। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের ফলে আমেরিকার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাধিধারিণী সুশিক্ষিতা স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইহাদিগকে গৃহকর্ম্মে অপারগ করে নাই কিংবা ছোট খাট কাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখায় নাই, বরঞ্চ ইহাদিগকে গৃহকর্ম্মে নিপুণ করিয়াছে। জননী রান্নাঘরে কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন কন্যা বৈঠকখানায় পিয়ানোতে বিটোভেন্ কিংবা শোপাঁর একটা কঠিন সুর কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না, তখন তিনি আসিয়া পিয়ানোতে সুরটী বাজাইয়া দিয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলা ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে বসিয়া পড়িতেছে—শুনিলেন মেয়ে ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, কিংবা ছেলে ল্যাটিন ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেছে না, জননী আসিয়া তাহাদের পড়া বলিয়া দিলেন; এই প্রকার দৃষ্টান্ত বহু পরিবারে দেখিয়াছি।

আমাদের দেশের অনেক পরিবারে ঘরের ছেলেমেয়েদের পিতার সঙ্গে একটা ভয়ের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার সঙ্গে সহজভাবে মিশিবার—সরলভাবে কথাবার্ত্তা বলিবার আনন্দ ছেলেমেয়েরা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকায় ঠিক ইহার বিপরীত। সমস্ত দিনের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পিতা ঘরে আসিলেই ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দেয়; পিতা কাহাকেও পিঠে করিয়া কাহাকেও কাঁধে চড়াইয়া শিশুদের সঙ্গে খেলিতে বসিয়া যান। প্রতি সন্ধ্যায় "Daddy"র সঙ্গে খেলা করাটা শিশুদের কাছে সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার। এইরূপে শিশুকাল হইতেই পিতামাতার সঙ্গে ইহাদের এমন একটী সরল স্বাভাবিক যোগ স্থাপিত হয় যে ইহার প্রভাব শুধু শিশুদের ভবিষ্যৎজীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তা নয়, ইহাদের গৃহকেও পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে।

শৈশবে পিতার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ হওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করিতে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে যুবক যুবতী তেমন কোনো সঙ্কোচ বোধ করে না। শিশুকাল হইতেই পিতা ছেলেমেয়েদের ইহা বুঝিতে দেন যে "Daddy"ই তাহাদের পরম বন্ধু।

আমি যে শ্রেণীর গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহাদের ছেলেমেয়েরা খুব বাধ্য ও বিনয়ী হয়। একদিনের একটি ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। অপরাহ্নে আমি সিমেণ্ট করা ফুট্‌পাথের উপর বেড়াইতেছি এমন সময়ে একটি বালক স্কেটিং করিতে করিতে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। বালকটী কিছুমাত্র খেয়াল না করিয়া "বাঃ রে কি অদ্ভুত কাপড় পরিয়াছে!" (Oh, say, has n't he got a funny dress!) বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি বালিকা পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মহাশয়, মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমি কারণ বুঝিতে পারিয়া বালিকার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলাম। দ্বারে পৌছিতেই গৃহকর্ত্রী বলিলেন "আমি বারেন্দায় ব'সে হ্যারির অভদ্র ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলুম। ও সেজন্য নিশ্চয়ই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই" এই বলিয়া কম্পিতকলেবর বালকটিকে তলব করিলেন। বালককে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলে আমার কাছে সে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া গেল—মহাশয় আমি যা করিয়াছি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই! (Sir, I beg your pardon for what I have done.) বালককে কোলের কাছে টানিয়া আদর করিয়া আমি বিদায় হইলাম।

গৃহে পিতামাতার শাসনে, স্নেহে, শিক্ষার প্রভাবে সংযম, বাধ্যতা ও আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা ইহারা লাভ করে সন্দেহ নাই কিন্তু আমেরিকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেখিয়াছি ইহাদের জীবনে যেন একটা কঠিন দারিদ্র্য আছে; অর্থাৎ যাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষের জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে, এমন কোন সম্পদের খোঁজ যেন এরা পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে, শিশুকাল হইতে ইহারা যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা পায় না। পিতা তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা চাকুরী সম্বন্ধে যেমন কোনোপ্রকার কথা ঘরে আলোচনা করেন না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। পিতামাতা উভয়েই এ বিষয়ে উদাসীন। এইজন্য সন্তানদের মনের পরিণতিও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। শুধু তাই নয়, জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাদের এমন অদ্ভুত ধারণা যে যখন কালেজের শিক্ষিত যুবক অথবা যুবতীর মুখে তাহা শুনা যায় তখন বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। আমেরিকার সাধারণ পরিবারে যে ধর্ম্মে ঔদাসীন্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার কথাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। এই ধর্ম্মশিক্ষার অভাবের হেতু একদিকে বাণিজ্যমদমত্ততা, অপর দিকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা দেখা যায়। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে যেখানে বহুসংখ্যক বালকবালিকা প্রেরিত হয়, সেখানে শিশুকাল হইতে এমন সকল সংকীর্ণ ভাব ইহাদের মনে প্রবেশ করান হয় যে ফিলাডেলফিয়ার একজন ধর্ম্মযাজক এইরূপ স্কুলকে মহা অনিষ্টকর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক মত কণ্ঠস্থ করান, ভিন্নধর্ম্মীদের নিন্দাবাদ শোনান, এবং অন্যান্য ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা, রবিবাসরীয় স্কুলের কর্ত্তব্যের অঙ্গ।

ধর্ম্মমন্দিরের সংখ্যা দেখিয়া যদি কেহ আমেরিকার ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা আমার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মমন্দির ধর্ম্মনিষ্ঠার মাপকাঠি নয়। যাঁহারা আমেরিকানদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা জানেন ধর্ম্মমন্দিরগুলি আজ আমেরিকান্ সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে। সান্ধ্য-সমিতি, সান্ধ্য-ভোজ, যুবকদের সাহিত্য-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যই ধর্ম্মমন্দির বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। "Church kitchen," "Church pantry," ধর্ম্মমন্দিরের একটি অঙ্গ। বারান্তরে আমেরিকাতে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা সংস্কারের যুগ।

সমগ্র পৃথিবীতেই ভাঙাগড়া চলিতেছে—মানবপ্রকৃতি যেন একটা পূর্ণতর ক্ষেত্রকে চাহিতেছে। তাহাকে আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চাপিয়া রাখা যাইতেছে না। বাণিজ্য-সম্পদশালিনী আমেরিকাও আজ ধর্ম্মসংস্কারের জন্য সচেতন হইয়াছে—দেশের চিন্তাশীল সমাজসংস্কারকগণ আজ ধর্ম্মপিপাসুর ন্যায় বলিয়া উঠিয়াছেন "বিষয়-সুখে মন কি তৃপ্তি মানে?" সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে সম্পদ লাভের জন্য চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে, আমেরিকাও সে পথের যাত্রী। যে দিন ধর্ম্মকে লাভ করিয়া ইহারা ইহাদের কর্ম্মের ভিতরে সত্যকে চিনিতে পারিবে, সে দিন উভয়ের সামঞ্জস্যে বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা একটী নবীন মূর্ত্তি ধরিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রার্থিত।

আজিকে আকুল পরাণ আমার
চাঁদে চাহি নাহি কাঁদে
ক্ষয় পরবশ আলোক যাহার
জীবনের অপরাধে!
ওগো আমি চাই কিরণ তাঁহার
নয়নে মনের মাঝে,
ক্ষীণ শশধরে পূর্ণ করিয়া
মহিমা যাঁহার রাজে!
ঘুচাইয়া লাজ নাশিয়া তিমির
তুহিণ বক্ষ ভরি,
যিনি দেন আলো, সুধার পাত্র
চির অক্ষয় করি!
ব্রহ্মনিমেষে অতুল প্রকাশ
উষারে উন্মেষিয়া,
মিলন লগন মঙ্গল যাঁর
শেষ আলো পরশিয়া!

১৩।৯।১২ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভক্তবাণী।

(আমিয়েল)

আজিও দিনগুলি অসম্ভব উজ্জল, সুখোষ্ণ এবং মেঘনির্ম্মুক্ত। সূর্য্যালোকিত দিবস বিহঙ্গের কলসঙ্গীতে, ছায়াময় স্নিগ্ধ রাত্রি অসংখ্য তারকাপুঞ্জে অভিনন্দিত। বিশ্বপ্রকৃতি আজ করুণাময়ী অন্নপূর্ণা, প্রসাদ তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমায় গৌরবান্বিত। প্রায় দুই প্রহরকাল ধ্যানস্তব্ধ হৃদয়ে সম্মুখের অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে হইল, আমি যেন বিশ্বেশ্বরের উন্মুক্ত মন্দির দ্বারে সমুপস্থিত, লোকলোকান্তর, কত অগণ্য গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রলোক আমার নেত্র-পথে প্রকাশিত, প্রকৃতির বিচিত্র রঙ্গালয়ে আমি বিশ্ব-রাজের অতিথি। বায়ুলোকে ভ্রাম্যমান তারকাশ্রেণী পৃথিবী হইতে আমায় দূর দূরান্তে লইয়া গেল। কি অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে, অন্তহীন জীবনের কি সুমধুর শিশিরসিঞ্চনে আমার ভক্তিনম্র অনুরক্ত হৃদয় পরিপ্লাবিত হইল। আমি অনুভব করিলাম নিস্তরঙ্গ নীলিমাসমুদ্রে আমাদের এই ধরণী একখানি সুবর্ণ তরণীর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। কি গভীর কি প্রশান্ত আনন্দে আমার হৃদয় মন আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হইল সকল গ্লানি, সর্ব্বকলুষ, সমস্ত মালিন্য-মুক্ত হইলাম! প্রভুর চরণে আপনাকে নিবেদন করিয়া প্রতিদানে নির্ম্মাল্য স্বরূপ সুকুমার সুখ-স্নিগ্ধ নম্রতা, পবিত্র ভক্তি প্রেম ফিরিয়া পাইলাম।

প্রত্যেক অনিষ্টকর প্রবল প্রবৃত্তি আমাদিগকে ঘূর্ণী বাতাসের মত আবর্ত্তসঙ্কুল পতনের অভিমুখে টানিয়া লইয়া যায়। ইচ্ছার দুর্ব্বলতা আমাদের বুদ্ধিকে ক্ষীণ করে, পতনের ভীষণতা প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা স্থির থাকিতে পারি না, ভ্রষ্ট বুদ্ধিতে তাহাই নিরাপদ আশ্রয় ও অবলম্বন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিদারুণ মোহ আমা-দিগকে সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ভয়ানক এই বিপত্তি, কেন না এই অতলস্পর্শ খাত বাহিরের নয় অন্তরের; বিপুল অজগরের ন্যায় এই যে অগাধ আবর্ত্ত আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য নিয়ত করাল মুখব্যাদান করিয়া থাকে তাহাও বাহিরের নয়! ইহার একমাত্র রক্ষাকবচ, দৃঢ় একাগ্র চরিত্র বল, আমাদিগের বিবেক-বুদ্ধি, সেই চির অনির্ব্বাণ অন্তরের দীপ্তি, কর্ত্তব্য যাহার আলোক, প্রেম যাহার সুখভোগ্য উত্তাপ। এই আলোকই আমাদের জীবনের স্থির নিশ্চল ধ্রুবতারা, কেবলমাত্র ইহাই তরঙ্গকুটিল সঙ্কট জীবনসমুদ্রে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষীণ তরণীখানিকে নিরাপদ, চঞ্চল সংশয়দোদুল তরল সিন্ধুর অশেষ প্রলোভন, বাত্যাবন্যা এবং অন্ধকারের নিয়ত উদ্দাম আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। পবিত্রস্বরূপ অপার করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ অবি-চলিত বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবে বিবেকের এই চির নির্ম্মল স্থির জ্যোতিঃ উদ্দীপিত হয়।

আমার জীবন, আমার চরিত্রগত বিশেষত্ব যেন তরল ধারা; প্রভু তোমার চরণে তাহা নিবেদন করিয়া দিলাম, তোমার পাদোদক হইয়াই সে ধন্য হউক।

বুদ্ধি বিষয়, কিম্বা চরিত্র যাহাই হউক তাহার সুশৃঙ্খল নিয়মে সুব্যবস্থার কত পরিমিত ব্যয়, কেমন আরাম কতই না ক্ষমতা প্রকাশ পায়। কি করিব, কোথায় যাইব, মন আমার কি চায় তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা ইহাইত নিয়ম। নিজের বাক্য রক্ষা করা, কার্য্যে ব্যতিক্রম হইতে না দেওয়া ইহাও আবার সেই নিয়মের ভিন্ন রূপ। আবশ্যকীয় বস্তু আয়ত্তে রাখা, আপন শক্তির সদ্ব্যবহার করা, যাহা কিছু আমার নিজস্ব বিষয়, বুদ্ধি, বল, ক্ষমতাধীন রাখা ইহাও সেই নিয়মের প্রকৃতি। স্বীয় অভ্যাসচেষ্টা এবং প্রবৃত্তিকে সংযত করা, জীবনের সুশৃঙ্খলা সময়ের বিভাগ, কর্ত্তব্যের পরিমাপ এবং অধিকারের সম্মান রক্ষা করা, আপন মূলধন, আয়, আপনার শক্তি, দৈবঘটনা এবং ভাগ্যবলকে লাভজনক করিতে সক্ষম হওয়া সেই একই নিয়মসাধ্য। নিয়মের অর্থ আলোক, শান্তি; অন্তরের মুক্তভাব, এবং আত্মাধীনতা, এই নিয়মভিত্তিতে সকল শক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। চারুশিল্প, চরিত্রসৌন্দর্য্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান নিয়মবোধ, দ্বিতীয় সাধন নিয়মের বশ্যতা স্বীকার। মানব-জীবন সম্পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায় নিয়ম, ইহাই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের মূলাধার।

উষার সৌন্দর্য্যে আজ এমন উন্মাদনা কে ভরিয়া দিল? এ যে তরুণ যৌবনের নবাগত ষোড়শের অপূর্ব্ব আনন্দ, ফুলদোলের মালাকুসুমসজ্জায় মনোরম। যৌবনের কাব্যরসে, নির্দ্দোষ বাল্য সরল প্রেমধারায় হৃদয় প্লাবিত হইল। শ্যাম প্রান্তরবক্ষ ঈষৎ অন্তরাল করিয়া ঐ যে সুকুমার মুক্তাভাষ বাষ্পজাল জাগিয়া উঠিয়াছে, সে যেন তরুণী বধূর মুখের উপর একখানি অবগুণ্ঠন, তাহার বুকের উপরে নিভৃত অন্তরের রহস্য আবরণ। যাহা কিছু দেখিলাম তাহাই আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া আমার চক্ষে নূতন দৃষ্টি আনিয়া দিল, যেন আমার বিশুদ্ধ বিবাহসংস্কার হইল! দূর গ্রামমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ প্রকৃতির স্তবগাথার সহিত কেমন আশ্চর্য্য নিপুণ ভাবে তান লয় রক্ষা করিতেছিল। তাহারা যেন সঙ্গীত-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল বন্দনা গান কর, অনন্ত করুণাময়ের স্তোত্র পাঠ কর, জীবন সার্থক হউক। তাহারা আমার হৃদয়ে মীরা বাঈয়ের ভজন জাগ্রত করিয়া দিল, সেই শিশু-সুলভ সুখ, অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, পৃথিবীর সংস্পর্শ-রহিত উজ্জ্বল অনাবিল সন্তোষ, অনন্ত প্রেমানন্দে রাধিকার আত্মনিবেদন। এই বিস্ময়-অনুভূতির কি অনুপম চমৎকারিতা, ইহাই নন্দননিবাসী অমরগণের যক্ষ কিন্নর সিদ্ধ গন্ধর্ব্বদিগের ক্ষুধা নিবারণের, পূর্ণ পরিতোষের একমাত্র সামগ্রী।

যে পাঁচ দিন আমি এখানে আছি, একদিনও বাতাসের এমন পুণ্য, জীবনপূর্ণ, অনাময় স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করি নাই। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণ যেন স্বর্গ-সম্ভোগ। বিহঙ্গ জীবনের আনন্দ আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত করিতে সমর্থ হইলাম, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, প্রোজ্জ্বল সপ্তম সুরলোকে উন্নীত জীবন, নীলিমাপারাবারে অবলীলাক্রমে নিপুণ সন্তরণ, কেবলমাত্র দুইখানি লঘু পক্ষ আন্দোলন করিয়া দিগন্ত পার হইয়া যাওয়া।

নিজের জীবনের নীচে অনেকখানি স্বচ্ছ নীলিমা অনেক স্তর ধূলবর্জ্জিত সমীরণ সঞ্চয় করিতে পারিলে তবে দ্বিজশাবকের সর্ব্বভারবিমুক্ত এই অনিন্দ্য স্বাধীনতা সম্ভোগ করা সম্ভব। বিশ্বসৃজনের প্রত্যেক পদার্থ তত্ত্বই কবিত্বময়, তবে বাতাসই শুধু মুক্তির আনন্দ প্রচার করিতে জানে। হে স্বপ্নাবিষ্ট, একটি প্রভাতের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আবার জীবনভার মাথায় তুলিয়া লও।

মুনি ঋষিদের অবোলা জানোয়ারের প্রতি অসীম প্রীতি ছিল সে কথা ত কাহিনী নয়, আর তাহারি প্রভাবে তাঁহারা হিংস্র জন্তুদিগকে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়া রাখিতে পারিতেন তাহাও সত্য। নিষ্ঠুর ক্রূর জীবের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন কত প্রাণী আছে যাহারা আমাদিগের নিকট কেবলমাত্র শান্তিই প্রার্থনা করে, কিন্তু তবুও আমরা শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করিয়া থাকি! আমরা বর্ত্তমান সভ্য মানবগণ পৃথিবী গ্রহের সকল জীবাপেক্ষা ধ্বংস-প্রিয়, নিতান্ত ক্ষতিকারক এবং ভীষণ। প্রবলতমের অক্ষুণ্ণ অধিকার আমরাই আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের অরাজক বুদ্ধি, এই অভিনব স্বোপার্জ্জিত ক্ষমতাকে চিরন্তন রাজকীয় দিব্য-শক্তির শ্রেষ্ঠতা পশুবলের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া অন্য অপর সকল ক্ষীণবল জীবকে নির্ব্বাসিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কি অসঙ্কোচ, ঘৃণ্য এই ব্যভিচার, বিধি-দত্ত বিধানের কি নিন্দনীয়, মার্জ্জনার অযোগ্য এই প্রতিকূলাচরণ! প্রত্যেক পরস্বাপহারী জয়গর্ব্বিত ভূপতি এই মিথ্যা বিশ্বাস এবং কপটতার উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের প্রত্যেক মন্দ কাজেই পরমেশ্বরকে পৃষ্ঠপোষক করিবার প্রয়াস পাই, কেন না তাহা হইলে অতি সহজেই পাপকে পুণ্যে, নীতি-বিরোধী ব্যবসায়কে দৈববিধানে পরিণত করিবার সুযোগ হয়। প্রত্যেক হত্যাকার্য্য, যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণের বলিদান, দেবসেনাপতির বন্দনা গান করিয়া সমাপন হয় এবং ধর্ম্ম-যাজকগণ সানন্দে এই বিজয়নিষ্ঠুরতার আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া ধন্য হয়েন। এক সময়ে মানুষে পশুতে

যে সম্বন্ধবিরোধ দেখা যাইত এখন ক্রমে তাহা মানুষে মানুষে প্রসার লাভ করিতেছে।

তবুও ক্ষোভ নাই দুঃখ নাই, যদি বিবেকও আমাদের না ভ্রান্ত করিয়া থাকে, তবে আমরণ এ মানবজীবন মঙ্গলময়ের দয়ার বিধান বলিয়াই মানিয়া লইব। অপরকে সুখী করিয়া, প্রীত-পরিতৃপ্ত হইয়া শুভকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া পুণ্যসাধনে সচেষ্ট থাকিব, ইহাই আমাদের জীবনতরণীর স্থিতিবিধায়ক যন্ত্র, আমাদের দিগ্‌দর্শনের ধ্রুবতারা, আমাদের জীবনধারণের একমাত্র কারণ! অদ্য-প্রচারিত সকল ধর্ম্মই হয় ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু যতদিন এ বিশ্বাস জীবনে অবিচলিত থাকিবে ততদিন আদর্শভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবন সার্থক! যতদিন প্রেমের ধর্ম্ম, নিঃস্বার্থ প্রীতির সেবা বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন কিছুতেই মানবজীবনের মূল্য এবং সম্মানহীন করিতে পারিবে না, আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ভক্তি সরল বিশ্বাসের ভিত্তিবলেই অভয়ার এই পুণ্যবেদিকা চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী।

(বিলাতের পত্র)

সকল সময়েই মানুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায় তাহা নহে—সেই জন্য পৃথিবীতে কর্ম্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মানুষের মুদির দোকান খোলা উচিত ছিল সে ইস্কুলমাষ্টারি করে, পুলিসের দারোগা হওয়ার জন্য যে লোক সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অন্য ব্যবসায়ে এইরূপ উল্‌টাপাল্‌টাতে খুব বেশি ক্ষতি করে না কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়ই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মানুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে তাহাতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করে।

খৃষ্টানধর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্য আছে। খৃষ্টান শাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাবসঙ্গত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্তে প্রাচীনকাল হইতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য সৈন্যদলে যাহাদের ভর্ত্তি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যখন পাদ্রির কাজে নিযুক্ত হয় তখন ধর্ম্মের রং শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্‌টকে হইয়া উঠে। সেইজন্য য়ুরোপে আমরা সকল সময়ে পাদ্রিদিগকে শান্তির পক্ষে সার্ব্বজাতিক ন্যায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূমিকারূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায় ইহারা যাহাদিগকে হীদেন বলে তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খৃষ্টানের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনো দেবতার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয় এই রকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিরুদ্ধতা, এই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা পাদ্রি অন্য ধর্ম্মের লোককে সর্ব্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্ত্রধারী সৈন্যদলের মত অন্যকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিরুদ্ধতার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পৃথক এইটেই আমরা অনুভব করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে খৃষ্টান করিতে প্রস্তুত কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া সুবিচার করিতে পারে সেই সেতু বাঁধিয়া দেওয়া ত ইহাদেরি কাজ। কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃষ্টান পাদ্রিরা অখৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও আচারব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাঁহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু অন্য জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাদ্রিরা খৃষ্টান অখৃষ্টানের মধ্যে যত বড় প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর কেহই করে নাই। অন্যকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্ম্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চষমা পরিয়াছে। বিজেতা ও বিজিত জাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে তাহা শক্তির অভিমান—সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মানুষোচিত মিলনের সেই একটা মস্ত অন্তরায়—পাদ্রিরা সেই অভিমানকে ধর্ম্ম ও সমাজ-

নীতির দিক হইতেও বড় করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃষ্টানধর্ম্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে—তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃষ্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃষ্টান বেশি—ধর্ম্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্ত্তি ধরিয়া উগ্র রূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত সুসম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি ইনি মানুষ—ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন—তাহা খৃষ্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খৃষ্টানের পক্ষে যথার্থ খৃষ্টান হইবার মস্ত একটা বাধা আছে—কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে তিনিই সুওরাণী। এইজন্যে ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মস্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইঁহারা মর্ত্ত্যরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি যাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড এণ্ড্রুস্। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ইঁহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টানধর্ম্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কি মাধুর্য্য এবং উদারতা তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, "দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। সহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে—পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।" ইঁহার একজন বন্ধু ষ্টাফোর্ডশিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এণ্ড্রুস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অগষ্ট মাস এদেশে গ্রীষ্মঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিত ভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে সুলভ যে তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্য বিশেষভাবে আমাদিগকে কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্য লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়—বড় ছুটি পাইলেই সহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ, বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই সহরের উড়ুক্ষু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের ষ্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা তাঁহার খোলাগাড়িটি লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুনজ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাদ্রিনিবাস নহে। ইহা নূতন তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লবপুঞ্জের অস্ফুট ভাষায় মর্ম্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজস্র সৌন্দর্য্যের অবারিত অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্মঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য্য এমন ত আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কি ঘন ও তাহা কি নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, লাইব্রেরি সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্রগৃহস্থ ঘরে এই জিনিষটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের, আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিষটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারিদিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত

আস্বাদেরের ভাবটি ছোটবড় সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে, সমাজকে, দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জ্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ত্রুটি জিনিষটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্‌ম্ সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্ত্তা পরিয়া বেড়ায় এখানকার দেবতাও সেই রকম অত্যন্ত গম্ভীর ভদ্রবেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু এই ঘন গাম্ভীর্য্যের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়িল না। গুল্মশ্রেণীর বেড়ার দ্বারা বিভক্ত ঢেউখেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষুকে স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই; আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মীড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে;—ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে সকল প্রদেশ পার্ব্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় বন্যপ্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ—শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জ্জনীসঙ্কেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিং নামাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিঘ্নের ভয়ে হাম্বাধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্‌ম্ সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই—স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারিদিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে ৎসাহ দিবার জন্য ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্‌ম্ সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চারিদিকে বহুযত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারীর বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহে মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশঃ সৌন্দর্য্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্‌ম্ সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরো নানাদিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলব্রতে নিয়ত উৎসর্গ করা জীবন যে কি সুন্দর তাহা ইঁহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইঁহার জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মত নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইঁহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইঁহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

এই যে এক একটি করিয়া পাদ্রি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বসিয়া আছেন ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্ব্বদেশব্যাপী বৃহৎবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গণ্ডগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম্ম এদেশে শুভকর্ম্ম আকারে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার সূত্রে এদেশের সমস্ত লোকালয় মালার মত গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মত যাহারা এই প্রকার সর্ব্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কত বড় একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোনো নিখুঁৎ ব্যবস্থা চিরকালের মত পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না যাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি কোনো অনর্থ কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এদেশের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্ম্মমত নানাস্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্ম্মের আশ্রয়কে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরো রোগাতুর করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহই চার্চ্চের মধ্যে এমন অনেক পাদ্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা যাহা বিশ্বাস

করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং যাহা প্রচার করেন তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্য নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথ্যা যে সমাজকে নানাপ্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্ম্মের সিংহদ্বারকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া ধরে যাহাতে করিয়া ক্ষুদ্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায় মহত্ত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এই-রূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপের ধর্ম্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকেনা। চলা তাহার ধর্ম্ম—গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলি আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খৃষ্টান ধর্ম্মমত যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে ঘা খাইয়া তাহাকে প্রশস্ত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা যাহাকে খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্থূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃষ্টান পুরাণবর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থ-বাদীও নহে। য়ুরোপের ধর্ম্মপ্রকৃতির মধ্যে খুব একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত য়ুরোপ কখনই আপনার সনাতন ধর্ম্মমতকে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেয়ে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এতবড় একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হোক পাদ্রিরা এই যে ধর্ম্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ সুরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্ত্তব্যের স্থিতি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে—যখনই সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখনই আদর্শকে যতদূর সম্ভব খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে এই নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্য নিজেকে বাধ্য মনে করে না, সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানাদিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে তাহা অভ্যাসের অন্ধতাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু ইহারা বংশগত পাদ্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে;—নিজের চারিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না—সুতরাং, আর কিছুই না হউক, সেই নির্ম্মল চরিত্রের, সেই ধর্ম্মনৈতিক সাধনার সুরটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ নাই। ইহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না,—ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অব-মানিত করিতেছি। এখানে অধার্ম্মিক পাদ্রিকে সমাজ কখনই ক্ষমা করিবে না; সে পাদ্রি হয় ত ভক্তিমান না হইতে পারে কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে,—এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পদে তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্য একটা ধর্ম্মনৈতিক মোটাভাত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু সেইটুকুতেই ত সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড় বড় ধর্ম্মসমস্যা উপস্থিত হয় খৃষ্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাদ্রিরা ত তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যখন বোয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন? এই যে পারস্যকে দুই টুকরা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জন্য য়ুরোপের দুই মোটা মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বসিয়াছেন পাদ্রিরা চুপ করিয়া আছেন কেন? ভারত-বর্ষে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থায়, সেখানকার শাসনতন্ত্রে, সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরে-জের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না যাহাতে খৃষ্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া দুর্ব্বল অপমানি-

তের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন? তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি? ইংরেজিতে "পয়সার বেলায় পাকা, টাকার বেলায় বোকা" বলিয়া একটা চলতি কথা আছে বড় বড় খৃষ্টানদেশের ধর্ম্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান অথচ সমস্ত জাতি ব্যূহবদ্ধ হইয়া এমন সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্জ ভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহাতে সুদূরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখদুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে; এমন দুর্দ্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সর্ব্বজনীন সয়তানীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাদ্রি কয়জন? এমন কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে তাঁহারা দলের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চ্চের চিরপ্রথাসম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্য একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এইজন্যই কি যিশু তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন? জগতের সম্মুখে ইহা কোন্ সুসমাচার প্রচার করিতেছে? খৃষ্টানদেশের পাদ্রির দল স্বজাতির ধন্মতহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আগলাইয়া বসিয়া আছেন কিন্তু বড় বড় কোম্পানির কাগজ ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হুঁস নাই। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাদ্রিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধু কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য। কিন্তু দলের দিকে তাকাইলে এই কথা মনে আসে যে ধর্ম্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও একপ্রকারের জাত তৈরি করা হয়—তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জমিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম্ম মানুষকে মুক্তি দেয় এইজন্য ধর্ম্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই কিন্তু ধর্ম্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে সেখানেই ক্রমশ তাহার ছোট দিকটাই বড় দিকের চেয়ে বড় হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিষ অন্তরের জিনিষকে আচ্ছন্ন করে ও যাহা সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাই বৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না;—তাঁহাদের সেই পুণ্য জ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্ব্ব সমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অকৃতজ্ঞ।

বক্ষ চিরে রত্ন লই, পয়োধর মন্থন করিয়া
শুক্তি হতে মুক্তা আনি কেড়ে, লৌহফালে বিদারিয়া
সুকোমল শ্যামতনু তব, হেলায় হরিয়া লই
অন্নপান ক্ষুধা পিপাসার, জননী করুণাময়ী,
যত্নভরে তোরি বক্ষে চাপাইয়া পাষাণের ভার
হর্ম্ম্যগৃহ, রঙ্গালয়, অভ্রভেদী দেবতা পূজার
মন্দির নির্ম্মাণ করি, ছিঁড়িয়া বাসকসজ্জা তব
হাসিয়া রচনা করি বসন্তের পুষ্পে অভিনব
প্রণয়ের সুকুমার বাসর শয়ন, নিশিদিন
তবু হায় ধেয়ে চলে যায় প্রাণ দূর সীমাহীন
অই আকাশের পানে, পাখী যেথা পাখা মেলি ধায়
আনন্দের টানে, অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়
অপার আলোকে, যেথা কালো মেঘে নিবসে বিজুলি,
তপন তারকা শশী আঁধারের বক্ষ দেয় খুলি!

৯।৯।১২ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কবি য়েট্‌সের অভিমত।

আমার হাতে কবি য়েট্‌সের একটি বই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে সাহিত্য সম্বন্ধে কবির কতগুলি গদ্য প্রবন্ধ আছে।

প্রবন্ধ গুলি খণ্ড খণ্ড; তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ ভাবের অবিচ্ছিন্ন সূত্র নাই। আমার তাই মস্ত একটি সুবিধা হইয়াছে এই যে, বইখানি আমি আপন খুসি মত যখন তখন নাড়া চাড়া করিতেছি। সূত্র কোথাও ছিন্ন হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা মনে নাই।

আলোকের রশ্মি হীরকের নানা মুখ হইতে যেমন ঠিকরিয়া পড়ে, এই পুস্তকের প্রত্যেক পত্রের মুখে সেইরূপ ভাবের এবং কল্পনার জ্যোতিঃ ঝলসিয়া পড়িতেছে। শিরীষ গাছের হাল্কা ফিকে পাতার মত এই বইটির পাতাগুলি—ভাবের কিরণে ঝলমল্ ও কল্পনার হাওয়ায় মরমর্ করিতেছে। কোথাও কোন ভার নাই, জটিলতা নাই, বাধা নাই—এমন একটি পেলব লঘুতা, এমন একটি ললিত ছন্দের দোল, এমন অজস্র তারুণ্য যে পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে হয় যে বিশেষ কোন কথা পাইতেছি না বটে, কিন্তু একটি চির নবীনতার সমুদ্রে স্নান করিতেছি। ঠিক যেমন ভোরের বেলায় বাগানের মধ্যে চলিতে চলিতে একটি ঘনসবুজ স্নিগ্ধ শান্তি স্পর্শ করা যায়, পাতায় পাতায় মাণিকজ্বালা

আলোর হাসি মুখের উপরে চোখের উপরে অনুভব করা যায়, তেম্নিতরই এই বইটি পড়িলে লাগে।

আজ একটি ছোট প্রবন্ধের ছায়াবীথিকার ভিতর দিয়া আমার পাঠকদিগকে লইয়া যাইতে চাই। প্রবন্ধটির নাম "শরীরের শরৎকাল"—কিন্তু নাম হইতে তাহার বক্তব্য বিষয়ের কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না। সেটি তাই নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

কবি বলিতেছেন "আমাদের অনুভূতি ও ভাবনাগুলি এক গোপন বন্যার উর্ম্মিমালার শীকরের মত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু সে বন্যা যে কোন্ 'চাঁদে উন্মাদ', তাহা আমাদের দৃষ্টির ভিতরে ধরা দেয় না। আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন বেশ স্পষ্ট করিয়া বর্হির্বিষয়ের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা আমার মনকে আন্দোলিত করিত, এবং খুব তৃপ্তি বোধ না করিলেও যে সকল পুস্তকে বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য এবং ঝাঁঝালো তীব্রতা দেখিতে পাইতাম সেই সকল পুস্তকপাঠেই প্রীতিলাভ করিতাম।

"হঠাৎ এক সময়ে এই বাহ্যবস্তুর বর্ণনার ঝোঁক আমার চলিয়া গেল। তখন যে সব বই খুব কম জোর দিয়া কথা বলে এবং যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার রস আছে, সেই সব বই ছাড়া অন্য বই পড়িতেও আমার বিতৃষ্ণা জন্মিল। এ যে শুধু আমারি ভিতরকার পরিবর্ত্তন নয়, সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া সকল সাহিত্যিকগণই যে অধুনা এই শ্রেণীর অতিস্ফুট অত্যুজ্জ্বল ও তীব্র রচনার বিরুদ্ধে যুঝিতেছেন সে কথাটা কিন্তু তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি। অবশ্য এই সংগ্রামের ভিতরের কারণ সম্বন্ধে যে তাঁহারা সবাই সচেতন তাহা না হইতে পারে, কিন্তু এক সময়ে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে বহির্মুখিতা সাহিত্যকে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহারা তাহারি বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিতেছেন।"

কবি য়েট্‌স্ বলেন ফ্রান্সের সাহিত্যে এই পরিবর্ত্তন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। "ফ্লবেয়ার (Flaubert) যত রাজ্যের অদ্ভুত, বিস্ময়কর, এবং রমণীয় দৃশ্য ও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা চোখের কাছে কাণের কাছে ভিড় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। * * * কিন্তু কাউন্ট ভিলিয়ে দি লিল্ আদম * * * এমন সকল মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব একেবারে খসিয়া গিয়াছে—কেবল তাহাদের মধ্যে সেই একটি চরম একান্ত অধ্যাত্ম মুহূর্ত্তের ব্যাকুল তৃষ্ণা জাগিয়া রহিয়াছে যাহা মেঘের মত সমস্ত বস্তুকে কোন্ অতীন্দ্রিয় লোকে উড়াইয়া দিতে চায়। * * * আবার তাঁহার পরবর্ত্তী মেটারলিঙ্ক সেই তৃষ্ণার উদগ্রতাটুকুও ছিনিয়া লইয়াছেন। তিনি কতগুলি অস্ফুটপ্রাণ, কতগুলি উলঙ্গ সকরুণ বাষ্পময় ছায়াছবিকে আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন—অনন্ত অতলতার উপকূলদেশে তাহারা বসিয়া বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। এ যেমন ফ্রান্সের সাহিত্যে দেখি, তেমনি সে দেশের চিত্রকলাতেও এই একই রকম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। কোথায় সেই সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাটকীয় কাহিনীর উজ্জ্বল চিত্রমালা—তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষীণ, বেপমান, সংগ্রামে অপটু মানবদেহের চিত্র দেখা দিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রেও পরিষ্কার সীমারেখার পরিবর্ত্তে অতিসূক্ষ্ম অনতিস্ফুট রঙের এবং রেখার ছন্দবিন্যাস লক্ষিত হইতেছে।

"ফ্রান্সের মত ইংলণ্ডেও এই রকমেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাউনিং টেনিসন্ প্রভৃতির রচনায় যে কবিতা আপনার প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কিম্বা তাঁহাদের ঠিক সমজাতীয় না হইলেও, সুইন্‌বর্ণ কিম্বা শেলির মধ্যেও যে কাব্য ফুটিয়াছে,—সে যেন এখন তাহার চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহার কালের বিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ব, দর্শন, নীতিতত্ত্ব সমস্তই সে আত্মসাৎ করিয়া আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এখন সেই প্রাচীন কবিতার ছায়ায় এক নূতন কাব্য মাথা তুলিয়া সতেজে উঠিতেছে দেখিতে পাই। রোসেটি প্রথম ইহার সূত্রপাত করেন, কিন্তু তিনি কবি অপেক্ষা অধিক চিত্রকুশল ছিলেন বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ অনুরাগের সঙ্গে অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন নাই। এনড্রু ল্যাঙ্গ, এড্‌মণ্ড গস্, অস্‌টিন ডবসন্ প্রভৃতির হাতে এই নব্য কবিতা খুব একটি সংহত আকার লাভ করিয়াছে। সুবিখ্যাত কবি রবর্ট ব্রিজেস্ আবার এমন একটি অভিনব সূক্ষ্ম ছন্দের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন যাহা অশরীরী ছায়াময় অনুভূতির প্রকাশের পক্ষেই উপযোগী। * * * ইংরাজী চিত্রকলাতেও অধুনা এই ভাবটিই লক্ষ্য করা যায়। * * এইজন্য ইউরোপে আইডিয়াল আর্ট বলিতে অনেক সময় লোকে ইংলণ্ডের আর্টই বুঝিয়া থাকে।

"এই যে আবছায়া আলো, এই যে বর্ণের অনতিস্ফুট বিভাস, চিত্ররেখার বিরল ব্যঞ্জনা—শিল্পসাহিত্যে যাহার আমদানী দেখিয়া লোকে তাহার অবনতি ঘটিতেছে বলিয়াই মনে করে—আমি তাহাকেই 'শরীরের শরৎকাল' নাম দিয়াছি। কারণ আমি জানি যে শিল্পমাত্রেরই অন্তরে একটি অনাগতের স্বপ্নবিধুরতা জাগিয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের একজন কবি—যাঁহার ছন্দ শরতের ম্লানালোক সন্ধ্যায় সিন্ধুশকুনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের মতন—তিনি আমার এই নামটির অর্থ একটিমাত্র শ্লোকে জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

"এবে রবির কিরণে নামে
ভরা ক্লান্তির গুরুভার!
তবু কাজ কেন নাহি থামে
মিছে ক্ষেতে কেন ব'সে আর?"

"সত্যই এখন আমরা এমন সব বিষয়ে ঔৎসুক্য বোধ করিতেছি, যাহা বিজ্ঞান কোন দিন মানে নাই। যেমন ধর, ভাষার যোগ ভিন্নও মানুষের চিত্তের সঙ্গে চিত্তের একটি গোপন যোগ ঘটিয়া থাকে, কিম্বা যাহা অনাগত ও সুদূর তাহার স্বপ্ন, তাহার পূর্ব্বাভাস মানুষ কখনো কখনো পায়—এ সকল বিশ্বাস তো আমাদের মনে এখন আনাগোনা করিতেছে? * *

"গ্যয়্‌টে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং প্রভৃতি পূর্ব্বগামী কবিদের রচনায়, যাহা কিছু আছে তাহারি ভিতরকার তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন কার্য্যেই কাব্য প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিল; কিন্তু মানুষ এই বিশ্বজগতের সঙ্গে প্রণয় করিয়া ও তাহাকে জয় করিয়া অবশেষে আজ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যখনি এই কথা বলিয়াছে "আমি এই যাহা কিছু ছুঁইতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি—এ সমস্তই বাস্তব"—তখনি এই শ্রান্তি তাহাকে আবিষ্ট করিয়াছে। কারণ সে বেশ বুঝিয়াছে যে এ বাস্তব কেবলি হাওয়া, কেবলি ধুলা, কেবলি বাষ্প—আর কিছুই নয়। সুতরাং এখন শিল্পে ও কাব্যে তাহাকে তত্ত্ব খুঁজিতে হইতেছে,—সে যে পথ দিয়া প্রথমে যাত্রা করিয়াছিল সেই পথ দিয়াই তাহাকে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এই অবসাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় তত্ত্বের মধ্যে যাওয়া। তাই যে ভার ধর্ম্মপুরোহিতদের স্কন্ধে পূর্ব্বে ছিল, সেই ভার সমস্ত শিল্পকে সাহিত্যকে অধুনা গ্রহণ করিতে হইতেছে। মানবচিত্তাকে সকল জিনিসের অন্তরতর সত্য ও মহিমার দ্বারা ভরিয়া তুলিতে হইবে, কেবল বস্তুর দ্বারা নয়। রসায়নের বিশ্লেষণের স্থানে আল্‌কেমির রহস্যের পুনরাবির্ভাব ঘটাইতে হইবে। * * এখন হইতে কবিতা সকল বস্তুর সেই অন্তরতর গভীরতর সার সত্যের কবিতা হইবে। সুতরাং তাহার কায়া প্রায়শঃ ক্ষুদ্র ও সংহত হইবেই।"

কবি য়েট্‌সের আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে উদ্ধৃত আলোচনা পাঠ করিয়া 'গীতাঞ্জলি' যে কেন তাঁহার "রক্তকে চঞ্চল করিয়াছে" তাহা আশা করি রসজ্ঞ পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

কারণ "গীতাঞ্জলি"র কবি নিজেই লিখিয়াছেন:—

"আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলঙ্কার।
* * * *
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে,
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।"—গীতাঞ্জলি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

অভিজ্ঞতা।

আপনারে আমি আপনি আজিকে
করিব কঠিন পরীক্ষা
বুঝে লব মোর সত্য কোথায়
দিল সে আমায় কি শিক্ষা।

কি সে মোর সুখ কি সে মোর দুখ
কি সে জীবনের আনন্দ,
অন্তর মাঝে কি রাগিণী বাজে
বাহিরে তাহার কি ছন্দ!

যারে ভাবি আমি আপনার জন
কিবা গুণ তার কেমন রীতি—
যারে ভাবি পর সে কেমনতর
কেন তারে মোর না হয় প্রীতি?

মোর পছন্দ ভাল কি মন্দ
রুচিটুকু মোর শুচি অশুচি
কঠিন বিচারে আজি আমি তারে
বাহির করিব বক্ষ খুঁজি!

আপন বিচারে দেখি আপনারে
টুটে পড়ে যদি মোহের সাজ
যত কিছু ফাঁকি ছিল ঢাকাঢাকি
তেয়াগি জীবন সত্য আজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

স্বরলিপি।

বেহাগ—ঠুংরী।

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে
ঘন সৌরভ মন্থন পবনে জাগে কে জাগে।
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে কে জাগে
মম গভীর অন্তর বেদনে জাগে কে জাগে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ • ১´
সা ন্‌া II সা -া গা মা। পা -া না না I ননা -র্সা র্সা -না।
আ জি নি • র্ভ য় নি • দ্রি ত ভু॰ • ব •

• ১´ • ১´
। ধপা -া পা -হ্মা I ধা -া -মা -া। -া -া মা -গা I গগা -মা মা -া।
নে • জা • গে • • • • • কে • জা॰ • গে •

• ॥ ১´ • ১´
। -া -া গা গা I মা -া গা রা। সা -া ন্‌া প্‌া I ন্‌া -া ন্‌া -া।
• • ঘ ন সৌ • র ভ ম • ন্থ ন প • ব •

• ১´ • ১´
। সা -া সা -া I গা -া -া -া। গা -া সা -া I গা -া -া -া।
নে • জা • গে • • • কে • জা • গে • • •

•
। -মা -পা মা গা II
• • "আ জি"

১´ • ১´ •
সা সা II সা -পা পা পা। পা পা -া পা I পা -া পা -া। পা -া -া -া I
ক ত নী • র ব বি হ • ঙ্গ কু • লা • য়ে • • •

১´ • ১´ •
I পা -ধা ণা র্সা। র্গর্সণা -া ধা পা I মা -া গা -গা। মা -া গা -গা I
মো • হ ন অ• • ঙ্গু লি বু • লা • য়ে • জা •

১´ ০ ১´ ০ ১´
I মা -া -া -া। মা -া গা -গা I মা -া -া -া। -া -া গা মা I ধা -া পা মা।
গে ০ ০ ০ কে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ ক ত অ ০ স্ফু ট

০ ১´ ০ ১´ ০
। গা -া রা সা I ন্া -া ন্া -া। সা -া ন্া -ন্া I সা -া -া -া। সা -া ন্া ন্া I
পু ০ ষ্পে র গো ০ প ০ নে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ কে ০ জা ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I সা -া -া -া। -া -া পা পা I পা পা -না না। না -া না না I না -া না -না।
গে ০ ০ ০ ০ ০ এ ই অ পা ০ র অ ০ ম্ব র পা ০ থা ০

০ ১´ ০ ১´ ০
। র্সা -া -া -া I পর্সা -া র্সা র্সা। র্সা -া র্সর্রা র্সা I নর্সনা -া পা -া। না -া পা -া I
রে ০ ০ ০ স্ত ০ ম্ভি ত গ ০ ভী র আঁ০ ০ ধা ০ রে ০ জা ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I না -া -া -া। না -ধা পা -া I না -া -া -া। -া -া না না I র্সা র্সা -র্গা র্রা।
গে ০ ০ ০ কে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ ম ম গ ভী ০ র

০ ১´ ০ ১´
। র্সাঃ -র্রঃ র্সা র্সা I না -র্সনা না -া। পা -া সা -া I গা -া -া -া।
অ ০ স্ত র বে ০ ০০ দ ০ নে ০ জা ০ গে ০ ০ ০

০ ১´ ০
। গা -া সা -া I গা -া -া -া। -মা -পা মা গা II II
কে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ "আ জি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

—•—

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

বিজ্ঞাপন।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে আমরা আশ্রমের পক্ষ হইতে আগামী ৮ই পৌষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। সেদিন তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইয়া এই উৎসবের আনন্দবর্দ্ধন করুন এবং ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা আমাদের কাছে পত্র লিখিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
১২৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আগামী ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পুরাতন অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্রগণের সকলের এই উপলক্ষে উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
সম্পাদক, আশ্রমিক সংঘ।

আশ্রম কথা।

পূজাবকাশের পর আশ্রম পুনরায় খুলিয়াছে।

এবার অকালে শীত আসিয়া পড়িয়াছে। শরৎ আর শীতের মাঝখানে হেমন্তের শিশিরার্দ্র স্নিগ্ধতা ও মন্দীভূত রৌদ্রতেজের সাক্ষাৎ লাভের পূর্ব্বেই উন্মুক্ত প্রান্তরে উত্তরের তীব্র হাওয়ায় শীতের শৃঙ্গবাদন শোনা গিয়াছে।

পূজাবকাশের পূর্ব্বে আশ্রমে "শারদোৎসব" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। শীতের উৎসব ৭ই পৌষ আসন্নপ্রায়। তাহার জন্য এখন হইতে আয়োজন চলিতেছে।

৮ই পৌষ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব। এবার ৯ই পৌষ বিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হইবে এবং তাঁহাদের জীবনচরিতের আলোচনা হইবে।

৭ই পৌষের পর হইতে নূতন সেশন। অগ্রহায়ণের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ের বর্গগুলি পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইবে এবং আগামী বৎসরের জন্য নূতন পাঠ্যপুস্তক সকল স্থিরীকৃত হইবে।

বিদ্যালয় খুলিবার পরে 'আশ্রম সম্মিলনী' দুইবার মাত্র বসিয়াছে। কার্ত্তিকের পত্রিকায় আমরা তাহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। স্থির হইয়াছে যে আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা কেহ কেহ এক, কেহ কেহ একের অধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া এই সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করিবে। এই সভাটি আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে।

গ্রাম্যবিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। সাঁওতাল ছাত্রগণ অনেকেই বাংলা প্রথম ভাগ পড়িতে শিখিয়াছে, লিখিতে শিখিয়াছে এবং একশত পর্য্যন্ত সংখ্যা গণিতে শিখিয়াছে। কেহ কেহ দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছে।

আশ্রমের যে সকল ছাত্র ও অধ্যাপক বিদেশে অধ্যয়ন করিতেছেন, বিদেশ হইতে প্রায় প্রতিসপ্তাহেই তাঁহারা আশ্রমে পত্র লিখিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ ও শ্রীমান্ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে—একজন ইংরাজী সাহিত্য ও রচনার কোর্স ও আর একজন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের কোর্স গ্রহণ করিয়াছেন। কালিমোহন বাবু সেখানকার শিশুশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ উৎসুক্যের সহিত অনুধাবন করিতেছেন। শ্রীমান্ অরবিন্দ মোহন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। শ্রীমান্ সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র রায় আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

আগামী মাসে আশ্রম সংবাদ রীতিমত জমিয়া উঠিবে। যাঁহারা আশ্রমের খবরের জন্য বুভুক্ষু হইয়া থাকেন তাঁহাদের সেই আশ্বাস দিয়া এবারকার সংবাদ এখানেই শেষ করিলাম।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

শালগাছের শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি।

গত আশ্বিনমাসে আমাদের আশ্রমের শালবৃক্ষে এক নূতন শ্রেণীর গুটিপোকা দেখিয়াছিলাম। এই পোকা গুলির বর্ণ ছাইয়ের বর্ণের মত—তাহার মধ্যে নীল, লাল, কালো বর্ণের অনেক বৈচিত্র্য আছে। আমরা সচরাচর যে সকল শুঁয়ো পোকা দেখি ইহারা সেই শ্রেণীর শুঁয়োপোকার মতন নহে। ইহাদের পৃষ্ঠে যে সকল লোম আছে তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। পেটের দুই পাশে অর্থাৎ পায়ের ঈষৎ উর্দ্ধে অজস্র দীর্ঘ লোম আছে। এই রোমগুলি কোমল ও ধূসর বর্ণ। ইহাদের মাথার উপর দুইটি রোমগুচ্ছ এক চতুর্থ ইঞ্চি ($\frac{1}{4}$) ব্যবধানে স্থাপিত। এই রোমগুচ্ছের পরিধির উর্দ্ধাংশের বর্ণ লাল, নিম্নাংশের বর্ণ শুভ্র। এই পরিধির ঈষৎ উর্দ্ধে আরও দুইটি রোমগুচ্ছ আছে। এই দুইটির বর্ণ ধূসর এবং স্বল্প নীলাভাযুক্ত। ইহাদের পায়ের সংখ্যা মোট ষোলটি। তন্মধ্যে গলার কাছে যে ছয়টি পা,—তিনটি করিয়া দুই পাশে স্থাপিত থাকে,—সেগুলি অন্য দশটি পা অপেক্ষা ছোট এবং তীক্ষ্ণ—অনেকটা বড় চেলাবিছের পায়ের মত। এগুলির সাহায্যে ইহারা বৃক্ষের গায়ে লাগিয়া থাকিতে অনেকটা সুবিধা পায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে পৌনে তিন ইঞ্চি। এই তো গেল ইহাদের আকার, আয়তন, অঙ্গ, অবয়ব এবং বর্ণের কথা—এখন বলিব ইহাদের খাদ্যের বিষয়ে।

খাদ্য।

ইহারা শালপাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। আমরা তসরের গুটিপোকা স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় শালের পাতার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা পত্র-ভক্ষণের ক্ষিপ্রতায় পূর্ব্বোল্লিখিত গুটিপোকার ভক্ষণক্ষিপ্রতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা দেখিতে দেখিতে বড় বড় শালের পাতা নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। অন্যান্য পোকারা যেরূপ নীরবে আহার করে, ইহারা তেমনটি করে না। পোকাগুলিকে আমরা শয়ন শয্যার কাছে রাখিতাম বলিয়া, গভীর রাত্রে যখনই একটু সজাগ হইয়াছি তখনই কট্ কট্ শব্দ শুনিয়াছি। সেই ধ্বনি অল্প সময়ের জন্য নয়—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। মিস্ত্রী লৌহ প্লেটে স্ক্রুবোল্ট প্রবেশ করাইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ। এই সঙ্গে বলিয়া রাখি ইহারা একটু নিদ্রাপ্রিয় বলিয়া দিনের অধিকাংশ সময়ে গাছের ডালে একেবারে গা মিশাইয়া ঘুমাইয়া থাকে। এই জন্যই রাত্রিকালে ইহাদের মুখটা একটু বেশী চলে।

গুটি।

ইহাদের গুটিনির্ম্মাণ কৌশল একটু নূতন। গুটিনির্ম্মাণের কিছু পূর্ব্ব হইতে এই শুঁয়ো অন্যান্য প্রজাপতি-কীটের মত চুপ করিয়া নিস্পন্দভাবে থাকে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া স্বীয় দেহের রোমগুলিকে ইহারা অভিনব প্রণালীর সাহায্যে দেহচ্যুত করিয়া মুখের লালার সাহায্যে একটি আবরণ নির্ম্মাণ করে। আবরণটির গড়ন মৃদঙ্গের সরু অংশের আকারের মত, অবশ্য অত বৃহৎ নয়। এই আবরণটি ডালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংলগ্ন থাকে। পোকাটি এই আবরণের ভিতরে থাকিয়া একটি পুত্তলীতে পরিণত হয়। এই পুত্তলীর আকার বলিতে গেলে অবিকল মধুমালতীর গুটিপোকার মত। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে যে আবরণটির কথা বলিলাম তাহা নিশ্ছিদ্র। বৃষ্টি ও অন্যান্য বিপদাপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্তই সুকৌশলে এই বহিরাবরণটি ভিতরের পুত্তলীটিকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হয়।

প্রজাপতি।

উক্ত শুঁয়ো পোকাটি প্রায় পনেরো দিন উক্ত পুত্তলীর মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ অবয়বপ্রাপ্ত প্রজাপতি হইয়া পনেরো দিনের দিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন যে প্রজাপতির আবরণমধ্যস্থিত পুত্তলী হইতে এক প্রকার তরল আঠার মত পদার্থ বাহির হয়। এই তরল আঠাই বহিরাবরণকে সিক্ত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কোমল করিয়া দেয় বলিয়া প্রজাপতি অনায়াসেই তাহা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে। এই প্রজাপতির পক্ষদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ লাল, মাথা শুভ্র, পেটের তল শাদা। ইহাদের গড়ন অনেকটা মধুমালতীর গুটিপোকার প্রজাপতির মত।

শ্রীসুধাকান্ত রায়।

IMPERIAL LIBRARY

ব্রহ্মবিদ্যালয়

"ধর্ম্মশিক্ষা" উল্লিখিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয়—আশ্রমের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত। "ধর্ম্মশিক্ষার" সহিত ইহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। ৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য—।০ আনা মাত্র। আমার নিকট পাওয়া যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—আদিব্রাহ্মসমাজ।

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্‌, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী।

১। মাধ্যন্দিন-শতপথ ব্রাহ্মণ (বহুটীকা সম্বলিত আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ) প্রথম খণ্ড ৩৲; দ্বিতীয় খণ্ড ২৸০।

২। উপনিষৎসংগ্রহ (মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড ।০ আনা; ২য় খণ্ড ।৶০ আনা।

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন (মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ), ১ম খণ্ড ১৷০ আনা; ২য় খণ্ড ৸০ আনা।

৪। পালিপ্রকাশ (পালিভাষায় সম্পূর্ণ, ব্যাকরণ ও পালি পাঠাবলী একত্র) ২৸০ আনা, বাঁধান ৩৲ টাকা।

৫। বিবাহ মঙ্গল ।৶০ আনা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অষ্টম বর্ষ! **ভারত-মহিলা।** অষ্টম বর্ষ!

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৷৶০ দুই টাকা দশ আনা। নমুনা ।০ চারি আনা।

বৈশাখ হইতে অষ্টম বর্ষ চলিতেছে।

বিগত সাত বৎসরে স্ত্রীপাঠোপযোগী মাসিক পত্রিকার মধ্যে ভারত-মহিলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা, সন্তান পালন, গৃহস্থালি প্রভৃতি বিষয়ক মহিলাদিগের অবশ্যপাঠনীয় এবং নানাবিধ চিত্তাকর্ষক, কবিতা ও সুলেখকগণের চিন্তাপূর্ণ রচনায় কলেবর পুষ্ট করিয়া এবং সুন্দর সুন্দর চিত্রে শোভিত হইয়া প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত-মহিলা প্রকাশিত হয়। আশা করি, এবার বঙ্গের গৃহে গৃহে ভারত-মহিলা পঠিত হইবে।

অর্দ্ধমূল্যে পুরাতন ভারত-মহিলা।

১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের বাঁধান ভারত-মহিলা কিছুদিনের জন্য অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ২য় বর্ষ ফুরাইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বর্ষেরও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সত্বর পত্র লিখুন।

আরও সুবিধা—যিনি উক্ত পাঁচ বৎসরের ভারত-মহিলা এক সঙ্গে ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে মাত্র ৬৲ টাকাতেই সমস্তগুলি দেওয়া যাইবে।

৭ম বর্ষের বাঁধানো ভারত-মহিলা ২৷৶০ আনা মাত্র।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ,

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়, উয়ারী; ঢাকা।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গত অগ্রহায়ণ মাসে ৫ই বুধবার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ, ১২ই বুধবার শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯সে বুধবার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ২৬সে বুধবার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আগামী পৌষ মাসে ৩রা বুধবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, ১০ই বুধবার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, ১৭ই বুধবার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ২৪সে বুধবার শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সমাজ, যন্ত্রালয় ও তত্ত্ববোধিনী সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র টাকাকড়ি তাঁহার নামে, ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭ই পৌষ।

মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিনোপলক্ষে তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ গৃহ-মন্দিরে প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

THE

TRUE CHRIST.

BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTY.

Contains opinions of one anent Jesus Christ, who stands outside the pale of the popular Christianity. Treated in an unsectarian way. Matters taken from Bible, Koran, History, Hindu & Buddhistic Scriptures. Profitable reading to all.

Price as. 6only.

To be had of the Manager,
Adi Brahmo Samaj,
55, Upper Chitpur Road,
Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮৩৪ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্যকে দেখা।*

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখ্‌চি কানে শুন্‌চি তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্চে না। আমরা কাকে দেখ্‌তে চাচ্চি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে। আমাদের মনে হচ্চে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে যেন আমরা কাকে দেখ্‌তে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনো মেলা হয় নি—আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মত একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয়নি সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

কিন্তু জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখ্‌ব না, সত্যকে দেখ্‌ব এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগচে। এই যেমন মাটি জল আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখ্‌চি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখ্‌ব এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্য নিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখীর যখন চোখ ফোটেনি, যখন আলো যে কি সে জানেও না তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করচে। যতক্ষণ সে আলো দেখেনি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জান্‌চে—সমস্তকে এক মুহূর্ত্তে এক আলোতে এক যোগে জানা যে কাকে বলে তা সে বোঝেও না কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্তা আছে যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরম্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্তা বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য ব'লে সর্ব্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে—এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়াফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে—সেদিন আমরা যেদিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখ্‌ব না—অখণ্ড সত্যকে দেখ্‌ব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্চে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে এই জন্যেইত রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করচি তাঁকে প্রণাম করচি। তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাক্‌বে—আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয় যুক্তি নয় কিছু নয়—অমনি সহজে দেখা—অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা, অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনি অতি সহজে উপলব্ধি যে তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে নাচ্‌চে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে

* শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয় তিনিই আমাকে ধরে আছেন;—এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয় তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখচি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্চে—তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখচি—তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করচি, তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করচে, তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্চি।

তাই আমি তোমাদের বলচি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্চেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বস্‌তে পারলে কখনই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর সমস্তকে সে ধরচে, ছাড়চে, হারাচ্চে; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্চে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে—অন্য জিনিষের মত যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই যে তার পরম সাথীকে সাক্ষাৎ করে জান্‌তে চায় তার কান্না কি শুন্‌তে পাচ্চ না? তাকে আর তুমি পদে ব্যর্থ কোরো না—তার কান্না থামাও। তোমার আপনকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্যে এস এস, প্রতি দিন সাধনায় বোস। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে, তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্দ্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকলোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি। মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে, তখন মুহূর্ত্তকালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো, তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি। এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বস্‌বে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সাম্‌নে এসে বসেছি এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্ত্তেই মন সহজ করে বল্‌তে পারে—যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে—কিন্তু প্রতিদিন বস্‌তে বস্‌তে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠ্‌বে—ক্রমেই তাঁর কাছে পৌঁছতে আর দেরি হবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যে শৈশবের স্থান।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পরে আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে শৈশবলীলা সম্বন্ধে দুটি আশ্চর্য্য গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। একটি রবীন্দ্রনাথের "শিশু" আর একটি তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তক "জীবন-স্মৃতি"। এই দুইখানি বইতে শিশুর রাজ্যের 'সকল উদ্দেশহারা সকল ভূগোল ছাড়া অসম্ভব দেশের' যে হাওয়াটি বহিয়াছে তাহাতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপরকার নিয়মের কঠিন ও জীর্ণ মুখোস্ একেবারে খসিয়া গিয়াছে এবং দেবদৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর রাজপুত্র রাজকন্যার সমস্ত মায়াছবি বিশ্বের চির নবীন সৌন্দর্য্যের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবি বলিয়াছেন 'খোকা থাকে জগৎমায়ের অন্তঃপুরে তাই সে শোনে কতই যে গান কতই সুরে।' এবং 'আমরা থাকি জগৎপিতার বিদ্যালয়ে।' 'জীবন-স্মৃতি'তেও এই অন্তঃপুরের খেলাঘরের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি, রহস্যানুভবের স্মৃতি জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন খুব অল্পই বড় লোকের আত্মজীবনী দেখিয়াছি, যাহাতে শৈশবের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তাহার অতি তুচ্ছ খেলাধূলার কথা, আশানৈরাশ্যের কথা, হাসিকান্নার কথা বড় একটি আনন্দের সঙ্গে বর্ণিত হয় নাই। রাস্কিনের 'প্রিটারাইটা', রুশোর 'কন্‌ফেশনস্' শৈশবকে কি একটি সোনার স্বপ্নময় কল্পনালোকে মণ্ডিত করিয়া কেমন অপরূপ রমণীয় করিয়া দেখিয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা বলিয়া যেন লেখকের আর শ্রান্তি নাই,—সে যেন হারানো গান ফিরিয়া পাইবার মত—গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কোন মতেই সুরের সুখটুকু উবিতে চায় না, সমস্ত রোদের মধ্যে তাহার মোহ মিশিয়া যায়, বাতাসে তাহার বেদনা কাঁদিতে থাকে, আকাশের নীলিমায় তাহা ডুবিয়া রহে, মনের গহ্বরে কোন্ অতল গোপনতায় হারাইয়া যায়!

কবি য়েট্‌স্ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজীতে অনুবাদিত 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন "এমন একটি নিষ্পাপ সরলতা সাহিত্যেতো আর কোথাও দেখি নাই! শিশুদের কাছে যেমন পাখীরা, গাছের পল্লবেরা অত্যন্ত নিকটে, ইঁহারও কাছে তাহারা তেমনই নিকটে।"

য়েট্‌সের এই কথাটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া বোধ হয় নাই। আমার মনে হইয়াছে যে, কোন বৃহৎ প্রতিভার জীবন-চরিত আলোচনার কালে আমরা তাঁহার শৈশবের মধ্যে তাঁহার পরিণত মানুষটির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা কেবল তাহাই অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, কিন্তু প্রতিভার পরিণত রূপের মধ্যে শৈশবের কোন চিহ্ন খুঁজি কি? শৈশবের সেই 'নিষ্পাপ সরলতা,' সেই চিরতারুণ্য, সেই অনন্ত বিস্ময়, 'জগৎমায়ের অন্তঃ-

পুরের' ভিতরে প্রবেশ করিবার সেই সহজ অধিকার ?—এ গুলি কি শুধু শিশুরই বিশেষত্ব, বড় প্রতিভারও কি এই গুলিই বিশেষত্ব নয় ?

আমাদের মত সাধারণ মনুষ্যের জীবনে বাল্য, যৌবন প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য এই চারি অবস্থা দেখা যায়, কিন্তু প্রতিভার জীবনে কেবল দুইটিমাত্র অবস্থা দেখিতে পাই। বাল্য এবং যৌবন। যৌবনের পরে প্রৌঢ় বয়সের যে একটি পরিম্লান হেমন্ত কালের নিস্তব্ধ নিঃঝুম অবসন্নতা দেখা দেয়,—যখন ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষপল্লব জীর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, নদীবেগ প্রশান্ত, রবিকিরণ মন্দীভূত, আকাশ হিমবাষ্পে আচ্ছন্ন—প্রতিভা যে সে অবস্থায় পা না দিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যৌবনের অবসানে পুনরায় শৈশবের সরল-নির্ম্মল আনন্দের মধ্যে গিয়া পড়েন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

"ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে
তরণী ডুবে সুদূর জলে
মরণ-দূত উড়িয়া চলে
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ পারাবারের তীরে
শিশুর মহা মেলা!"

বাহিরে যখন আকাশের রঙ্ পাণ্ডু হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহাদের কাছে সেই পাণ্ডুর বর্ণের কোন নিরানন্দ ম্লানিমা নাই—সে 'গোধূলি লগ্নে'র 'বিবাহের রঙে'র মত হইয়া দেখা দেয়। সেইজন্য 'কেশে তোমার ধরেছে যে পাক' একথা তাঁহাদের কাছে বলিলে তাঁহারা উত্তর দেন,—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পরে এত নজর কেন ?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো!"

তাঁহাদের ভিতরে জরা এবং বার্দ্ধক্য কোথাও প্রবেশ করিবার পথ পায় না—বাহিরে যতই রিক্ততা, অন্তরে ততই প্রাচুর্য্য;—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! শিশুর মত তাঁহাদের খেয়ালও থাকে না,—সংসার-সমুদ্রের যে তীরে তাঁহারা আনন্দে খেলিতেছেন সেখানে কত ঝড় ঝঞ্ঝা কত মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। কারণ, তাঁহাদের কাছে সমস্ত জীবনের ভালমন্দ সকল অভিজ্ঞতাই আনন্দ-সঙ্গীতের নব নব মূর্চ্ছনার মত ধ্বনিত হইয়া উঠে।

সেই জন্য দেখি যে এই পরিণত প্রতিভার কাছে শিশুজীবন বড় একটি মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য বহন করিয়া আনে। শিশুর সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরের এক জায়গায় যে গভীর যোগ আছে, বোধ হয় শৈশবলীলার মধ্যে তাহাই তাঁহারা অনুভব করিতে থাকেন। সকলেই জানেন ডিকেন্স জর্জ্জ এলিয়টের উপন্যাসে এই শিশুচরিত্র কত বড় স্থান পাইয়াছে। ডিকেন্সের উপন্যাসে শুধু শিশু-চরিত্রের অধিক স্থান মাত্র নয়; তাহা আগাগোড়াই শিশুর মত অমূলক হাসিকান্নার লীলার দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহা দেখিয়া অনেকে ডিকেন্সের গল্পগুলিকে ছেলেমানুষী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। জর্জ্জ মেরেডিথ্ এই কারণে ডিকেন্সকে পছন্দ করিতেন না। যেমন ধর 'অলিভার টুইষ্ট' নামক সর্ব্বজনপরিচিত কাহিনীটি। তাহাতে 'বাম্বল' প্রভৃতি চরিত্রও যেন বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে ছেলেমানুষের ভয় ও বিস্ময়ের দ্বারা সৃষ্ট—ডিকেন্সের সকল ভীষণ চিত্রগুলিও এই জন্য ঠিক বাস্তব নহে। ইহা তাঁহার দোষ হইলেও যে বাল্যরস তাঁহার সকল রচনায় পাওয়া যায় তাহা যেমন সরল ও উপভোগ্য এমন তো কোন জটিল আধুনিক উপন্যাসও নয়। ভিক্টর হুগোর 'লে মিসারেব্‌ল্' নামক সুবিখ্যাত উপন্যাসে সকল দুঃখ পাপ ও ভীষণতার চিত্রের মধ্যে শৈশবের হাসিকান্না কেমন সুন্দরভাবে গাঁথিয়া গিয়াছে! কোসেট্ যেমন ছেলেমানুষ, জিন্ ভ্যালজিন্‌ও এক জায়গায় তেমনি ছেলেমানুষ। পাপচিত্রের মধ্যেও মাষ্টার গর্ব্বো ও এপোনিন্ শিশুর মত কি সকরুণ ও সুন্দর! এই শৈশবের একটি হিল্লোল এই উপন্যাসটির সমস্ত পাপ ও দুর্জ্জনতার অন্ধকার রসাতলের ভিতরে ভিতরে যদি না বহিত, তবে দাঁতের ইন্‌ফার্ণোর চেয়েও ঐ উপন্যাস ভীষণতর হইয়া উঠিত। এই শৈশবটি যে দারুণতম অপরাধের প্রস্তর-কঠিনতার মধ্যেও পুষ্পের মত মঞ্জরিত হইয়া উঠে, ভিক্টর হুগোর উপন্যাসই তাহার সাক্ষী।

ডিকেন্স, ভিক্টর হুগোর ন্যায় ষ্টিভেন্সনের উপন্যাসেও শৈশবের প্রাধান্য দেখিতে পাই। ডিকেন্সের মত কাল্পনিক করুণ ভীত এবং দুর্ব্বল ছেলেমানুষী নয়—একটা প্রবল, বলিষ্ঠ, দুঃসাহসিক ছেলেমানুষী। তাঁহার 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড,' 'কিড্‌ন্যাপ্‌ট্' প্রভৃতি গল্পের প্রধান নায়কই বালক এবং সেই বালকেরই দুঃসাহসিক নানা রোমাণ্টিক কাহিনীতে তাঁহার উপন্যাসমাত্রেই খুব বিস্ময়কর এবং ঔৎসুক্যপূর্ণ হইয়া আছে।

শুধু উপন্যাসজগতে কেন, কাব্যজগতে শৈশবের প্রাধান্য আরও অনেক বেশি। প্রতিভার পরিণতরূপের সঙ্গে শিশুপ্রকৃতির রূপের যে সাদৃশ্য আছে তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলিলাম। শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণই তাহার উদাহরণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Intimations of Immortality' 'অমরতার ইঙ্গিত' নামক বাল্যজীবনের স্মৃতি-অবলম্বনে রচিত সুবিখ্যাত কবিতাটি সম্বন্ধে সমালোচকপ্রবর ম্যাথু আরনল্ড বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের যে বাল্যকালেই খুব নিকট ও

ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এ কথাটা সত্য নহে। হয় তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাল্যজীবনে ঐরূপ হইয়া থাকিবে, কিন্তু সকল মানুষেরই বাল্যবয়সে যে প্রকৃতির সঙ্গে অমন গভীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকে এ কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া শক্ত। কিন্তু ম্যাথুআরনল্ড এ মত প্রকাশ করিলেও আমার মন এ কথায় সায় দেয় না। কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থের ও কথাটা যে বাস্তবিকই সত্য—সত্যসত্যই কোন বড় কবির শৈশবের মতন না হোক্ অল্পবিস্তর সকল মানবেরই বাল্যকালে পৃথিবী সম্বন্ধে একটা সহজ আনন্দ, কৌতূহল এবং বিস্ময় জাগ্রত থাকে। অবশ্য কালক্রমে শিক্ষার ও সামাজিক সংস্কারের তলে তাহা চাপা পড়িয়াও যায়। সকল মানবশিশুরই এই সাধারণ ধর্ম্মটি কবিশিশুর মধ্যে আরও উজ্জ্বল ভাবে ধরা পড়ে; সুতরাং কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অধিক বয়সে তাহা ম্লান হইয়া যায় বলিয়া যতই আক্ষেপ করুন, সেই কাঁচা সবুজ শৈশবটিকেই যে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারেন, ইহাতেই তাঁহাদের মতো কবিগণের যথার্থ গৌরব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের There was a boy—নামক একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। পাহাড়ের গায়ে যখন সন্ধ্যাতারা জ্বলিয়াছে,—তাহার আলো হ্রদের বুকে কাঁপিতেছে,—তখন গাছের ঘন ছায়ার তলে সেই হ্রদের পাশে দাঁড়াইয়া একটি বালক পেচকদের ধ্বনির অনুকারে হাতের সঙ্গে হাত সংবদ্ধ করিয়া আওয়াজ করিত। এই তাহার এক খেলা ছিল! তাহার এই খেলার অবচ্ছেদে যখন সেই পার্ব্বত্য বিজনদেশের সুনিবিড় স্তব্ধতা তাহাকে উপহাস করিয়া প্রকাশ পাইত, তখন অবহিত হইয়া শুনিতে শুনিতে হঠাৎ একটা বিস্ময়ের আঘাত তাহার হৃদয়ের সুদূরতম লোকে পর্ব্বতের নির্ঝরধারার কলধ্বনি বহন করিয়া লইয়া যাইত, সেই অরণ্য-পর্ব্বত-আকাশ-হ্রদের সমস্ত দৃশ্য তাহার সকল গাম্ভীর্য্য লইয়া কোন্ অজ্ঞাতে তাহার মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইত! কিন্তু সেই বালকের এই 'বিস্ময়ের আঘাত' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কোন্ বয়সের কোন্ শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে নাই?

অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত সকল শিশুই এমন গম্ভীর নয়।—আবার সকল শিশু যেমন নয়, সকল কবিও তেমি নয়। তাহারা "জগৎমায়ের যে অন্তঃপুরে" বাস করে, সেখানে তিনি শুধু "বিস্ময়ের আঘাত" দেন্ না, তিনি সমস্ত আকাশ ধরণীকে বিচিত্র রঙে রাঙাইয়া দেন্—সত্যকে নানা রূপে সাজাইয়া দেন! সেইজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের চেয়ে কম গম্ভীর কবিদের মধ্যে সেই শৈশবটি জাগিয়া থাকে, যাহার কাছে সকল জিনিসই নব নব কাহিনী, নব নব রূপে ভরিয়া উঠে। কবিরা বুড়ো বিজ্ঞানের পাঠশালায় যতই শিক্ষালাভ করুন, "জ্যোতিষশাস্ত্র মতে চলে সূর্য্যশশী, নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে রসারসি"—এ কথাটি তাঁহাদের কাছে হইবার জো নাই। কারণ, শৈশবের সেই রহস্যানুভূতি, সেই নবীন বিস্ময় তাঁহাদের কোনমতেই যায় না। গ্রহচন্দ্রকে কেহ বলেন স্বর্গের বাগানের মন্দার-পারিজাত, কেহ বলেন 'মুঠামুঠা ছড়াইয়া-দেওয়া মণিমাণিক্য,' কেহ বলেন প্রদীপমালা, কেহ বলেন 'আলোকের জালে ধৃত জোনাকির সারি'! কেহ বলেন তাহারা বাঁশীর ছিদ্র—"স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা, ছুটেছে শূন্যে উদ্দেশহারা"। গ্রীকরা তো প্রত্যেকটি তারাকে কত অলৌকিক মায়াময় কাহিনীর দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল! অথচ এ সমস্ত উপমাই প্রত্যেক শিশুচিত্তের বিস্মিত হৃদয়ের মধ্যে কত আনাগোনা করিয়া থাকে, তাহার হিসাব কে রাখে!

আমার তাই মনে হয় যে, যাহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেবদৈত্য রাজপুত্র রাজকন্যার পুরাণ কথা রূপকথা শুনিতে পীড়াবোধ করে, তাহারা সত্যসত্যই জগতের চিরশৈশবকে আর দেখিতে পায় না, জগৎ তাহাদের কাছে বড় প্রাচীন, বড় বিজ্ঞ, বড় গুরুভার। লোকে বিজ্ঞানকে গাল দেয় যে এ সকল আনন্দ উপভোগের বস্তু হইতে বিজ্ঞানই সকলের মনকে সরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা ঠিক্ নয়। বিজ্ঞান কি রহস্যের পার পাইয়াছে? বরং পূর্ব্বে যে রহস্য ছিল তাহাকে আরও একশো গুণ হাজার গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। আমি যে ঘরে বসিয়া লিখিতেছি তাহার দেয়াল, তাহার আসবাব্‌পত্র সমস্তই আমার কাছে কত তুচ্ছ, কিন্তু তাহার মধ্যে অণু পরমাণুদের যে প্রচণ্ড ধারণাতীত নৃত্যকল্লোল চলিয়াছে, তাহা একবার মনশ্চক্ষে দেখিলে কি অপরিসীম বিস্ময় বোধ হয়। এই শরীরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর অহরহ কি ভয়ঙ্কর গতি! বিস্ময় কোথায় নাই? বিজ্ঞানের ভূতপ্রেত যক্ষরক্ষ সহস্র রূপকথার ভূতপ্রেত যক্ষরক্ষের চেয়ে প্রবলতর বই কোন অংশেই হীনতর নহে।

"ডাকঘরে" শিশু অমল এবং তাহার হাড়পাকা সংসারী পিসামহাশয় মাধব দত্তের নিম্নলিখিত কথোপকথনটি,—আমি যাহা বলিতেছি তাহারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ:—

মাধব।

অমল বাবু, তুমিও বড় হলে পণ্ডিত হবে—• • সবাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে!

অমল।

না, না, পিসেমহাশয় তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি

পণ্ডিত হব না • • আমি, যা আছে সব দেখ্‌ব—কেবলি দেখে বেড়াব।

মাধব।

শোনো একবার! দেখ্‌বে কি? দেখবার এত আছেই বা কি?

অমল।

আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হ'য়ে চ'লে যাই!

মাধব।

কি পাগলের মত কথা! • • পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মত উঁচু হয়ে আছে তখন ত বুঝ্‌তে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড় বড় পাথর জড় ক'রে এত বড় একটা কাণ্ড করবার কি দরকার ছিল।

অমল।

পিসে মশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করচে? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি ক'রে নীল আকাশে হাত তুলে ডাক্‌চে! • • • •"

আমার তাই মনে হয়, যে-বিজ্ঞানে অমলের এই রহস্যবোধ দূর করিয়া দেয় সে যত বড়ই হোক্ না কেন, সে সম্পূর্ণ সত্য হইতেই পারে না। অতএব মাধবদত্তকে বিজ্ঞানবুদ্ধির আদর্শরূপে ধরিয়া লইতে আমিতো মহাশয় নারাজ।

কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে রহস্য যতই থাক্ মানুষের ভয় বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি বিচিত্র রসানুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞানের যে যোগ হয় নাই সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য দেখিতে পাই, যে-সাহিত্যের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব পড়িয়াছে তার কাছে—

"দীঘি থাকে নীরব হ'য়ে
দিবারাত্র
নাগ কন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র!"

এবং "সুখদুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে—
যেন তারা কিছু মাত্র
গল্প নহে!"—জগতের সমস্ত পুরাণ কথা রূপকথা তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

অথচ একদিন ছিল যখন জগতে মানুষ এই শৈশবের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছিল—তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে দেবদৈত্যের কত আশ্চর্য্য লড়াই হইয়া গিয়াছে, তখন বড় বড় বীরেরা কত আশ্চর্য্য কাণ্ডই করিয়াছে। আজ সেই ইলিয়াড্, রামায়ণ, মহাভারত, সেই গ্রীক্ পুরাণ হিন্দুপুরাণ সকল, সেই রাজা আর্থারের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী,—সেই দেশ বিদেশের রূপকথা কেবল শিশুদের পাঠ্য বিষয় হইয়া আছে এবং তাহাও পরিমার্জ্জিত সংক্ষিপ্ত মডার্ণ আকারে তাহাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এখনকার মানুষ তো সেই সকল কথায় বিশ্বাস করে না, তাহার কাছে সুরলোক আর নাই, গন্ধর্ব্ব অপ্সরার স্বর্ণবীণার ঝঙ্কার একেবারে অশ্রুত হইয়া গিয়াছে, আর এখনকার পৃথিবীতে ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, হেক্টর একিলিস, স্যার ল্যান্সেলটের মত বীরের কল্পনা তাহার পক্ষে মনে আনাও অসম্ভব হইয়াছে। এখনকার শিশুর মনের মধ্যে সেই সব সৌন্দর্য্য মহত্ব শূরত্বের মহিমান্বিত ছবি ভাল করিয়া জাগিতে না জাগিতেই এ কালের শিক্ষা ও সংস্কার তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়—তাহাকে বলে, এ কালে বীর হইতে পারে না, এ কালের সব মানুষ যাহা দেখিতেছ তাহাই মাত্র—রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবু মধুবাবু—আর কিছুই নয়। জগৎ সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিতেছ জগৎ তাহা নহে—হাওয়া মানে অক্সিজেন নাইট্রোজেন—জল মানে অক্সিজেন হাইড্রোজেন—মাটী কেবলি মাটী এবং আকাশ শূন্য ছাড়া আর কিছুই না। 'আমরা থাকি জগৎপিতার বিদ্যালয়ে!'

কিন্তু জগতের সেই শিশুকাল চলিয়া গিয়াছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমি তো মনে কোন সান্ত্বনালাভ করি না। শিশুকাল যে কোনমতেই যাইতে পারে না, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও যে পাইতেছি—কিন্তু হায়, যেটুকু প্রমাণ পাই তাহা সেই অতীত যুগের তুলনায় কত ক্ষীণ—যখন বনে বনে বনদেবীদের কত উৎসব জমিত, প্রত্যেকটি ঝরনার মধ্যে কত বিচিত্র রূপকথা বহিয়া যাইত! যখন স্বর্গলোক মানুষের কাছে সত্য ছিল, মর্ত্তলোকে বীর নর বীর নারী দেখা দিতেন, যখন মানুষের কাছে কোন জিনিস পুরাতন হইতে পারিত না! এখন কার্লাইলের মত দু একজন মনীষীর কাছে 'বীরপূজার' কথা শোনা যায় বটে,—কিন্তু বীরের দল পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে!

আমার বিশ্বাস আমাদের এ আধুনিক যুগ যতই রেলগাড়ী ষ্টীমার চালাক, টেলিগ্রাফ্ বসাক্, এরোপ্লেনে করিয়া সমুদ্র পার হউক, তাহার মধ্যে এখনি শ্রান্তি দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট নবীনতা নাই, বিস্ময় নাই। সে যাহাকে 'বাস্তব' বলিয়া অত্যন্ত জোরে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, সে বাস্তবের চারিদিকে কোথাও কোন ফাঁক নাই—কোন আনন্দ নাই। এ যুগকে আবার সেই সোণার শৈশবে ফিরিয়া যাইতে হইবে—দেবতাদের বীরদের পুনরায় ফিরাইয়া